দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

নৈরাজ্যের অবসানে এবারের বিধানসভা নির্বাচন বাঙ্গালির কাছে অগ্নিপরীক্ষা — পৃঃ ১১

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হিন্দুদের একজোট হতেই হবে —পৃঃ ১৩

৭৮ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২৭ এপ্রিল, ২০২৬।। ১৩ বৈশাখ, ১৪৩৩।। যুগাব্দ - ৫১২৮।। website : www.eswastika.com

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১৩ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২৭ এপ্রিল - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

'এসআইআর' প্রমাণ করল বাম-তৃণমূলের 'জল ভোটের' ধোঁকা কেমন দেখতে 'কণ্টকাকীর্ণ মার্গং'

□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

এত সোনা কার দিদি! □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ইসলামি রাজনীতির অ আ ক খ □ কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী □ ৮

পশ্চিমবঙ্গের নৈরাজ্যের অবসানে এবারের বিধানসভা নির্বাচন বাঙ্গালির কাছে এক অগ্নিপরীক্ষা □ খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল □ ১১

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে এবং নিজেরা বাঁচতে হিন্দুদের একজোট হতেই হবে □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৩

দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন, কোন কৌশলে গদি আঁকড়ে থাকার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল? □ প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য □ ১৫

পনেরো লাখের তত্ত্ব প্রতিশ্রুতি না বাস্তবতা?

□ অর্ণব কুমার দে □ ১৭

জাতিকে মহান করেছে হিন্দু ধর্মের দশবিধ সংস্কার

□ ড. অনিমেষ চক্রবর্তী □ ৩১

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আঁকা নারী প্রগতির বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

□ সৌমিত্র সেন □ ৩৫

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ই ক্রিকেটার ঈশান কিষাণের প্রেরণা

□ প্রদীপ মারিক □ ৩৭

বাংলাদেশে নৈরাজ্যের নতুন সংস্করণ

□ সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী □ ৩৯

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের প্রতি আবেদন

□ ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ □ ৪৩

কিছু মেঘ আছে তবুও মাতৃশক্তির আলোর ঠিকানা মেঘালয়

□ রাজলক্ষ্মী বসু □ ৪৬

পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা অবসানের লক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে ভয়ডরহীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতেই হবে

□ কৌটিল □ ৪৯

গল্প কথায় ডাক্তারজী □ সংকলক—বিমলকৃষ্ণ দাস □ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯ □ অঙ্গনা : ২০ □ সুস্বাস্থ্য : ২১-২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে
৪ মে
২০২৬

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৪ মে
২০২৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতির এক প্রবহমান ধারা। ভারতীয় সাহিত্য, সংস্কৃতির গভীর সাধনা থেকে শুরু করে ভারতীয় সমাজ, দর্শন ও রাষ্ট্রভক্তির এক যুগান্তকারী প্রেরণাপুরুষ তিনি।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কবির ১৬৬তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে স্মরণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০্) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র রক্ষার নির্বাচন

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে 'নির্বাচন' হইল গণতন্ত্রের উৎসব। ভারতীয় সংবিধান প্রণীত হইবার পরবর্তী কালে সাংবিধানিক সংস্থা 'জাতীয় নির্বাচন কমিশন'-এর তত্ত্বাবধানে লোকসভা এবং প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকারের মেয়াদকাল পাঁচ বৎসর। ১৯৫০-পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বারংবার সরকার পরিবর্তন হইলেও সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারার বিপ্রতীপে ধাবিত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭ সালে ভয়াবহ বিভাজনের সম্মুখীন হয় অখণ্ড বঙ্গপ্রদেশ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের বলি হয় সমগ্র পূর্ববঙ্গ। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধীবাদ ও মার্ক্সবাদে মাদকাসক্ত হয় বাঙ্গালি জাতির একাংশ। ইহার পরিণামে দীর্ঘ আড়াই দশক ক্ষমতাসীন থাকে কংগ্রেস এবং তাহার পর সাড়ে তিন দশক কমিউনিস্ট অপশাসনে দীর্ণ হয় পশ্চিমবঙ্গ। সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরে রাজ্য সরকারে মাত্র দুইটি রাজনৈতিক শক্তি বিরাজমান থাকা চরম অগণতান্ত্রিকতার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। সুস্থ গণতান্ত্রিক চেতনানুযায়ী অন্যান্য রাজ্যে পাঁচ বৎসর অন্তর সরকার পরিবর্তনের এহেন ধারার বিপ্রতীপে পশ্চিমবঙ্গের এই উদাহরণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকদিগের ভ্রূ-কুঞ্চনের কারণও হইয়াছে। ৬০ বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন দুইটি রাজনৈতিক শক্তি রাজ্যবাসীর উপর তাহাদের জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় শাসন বলবৎ করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান, ১৯৭১ পরবর্তী পর্যায়ের বাংলাদেশ হইতে অনুপ্রবেশ এই ৬০ বৎসরে রাজ্য সরকার ও শাসক দলের অনুকম্পায় তীব্র হয়। অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে শাসন ক্ষমতা সুরক্ষিত করার প্রবণতা এই ভোটভিখারি, সেকুলার রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। পরিণামে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহের জনবিন্যাস বিপজ্জনকভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে।

২০১১ সালে বামপন্থীদের অপশাসনের অবসানে রাজ্যবাসীর মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়। রাজ্যে সুদিনের প্রত্যাবর্তনের আশায় প্রতীক্ষারত বাঙ্গালির মনের আশা-ভরসা অচিরেই পরিণত হয় গভীর উদ্বেগে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার সংঘটিত করে চিটফান্ড কেলেঙ্কারি। নিঃস্ব, কপর্দকহীন হইয়া পড়ে অসংখ্য দরিদ্র জনসাধারণ। নারী নির্যাতন রাজ্যব্যাপী ভয়ংকর আকার ধারণ করে। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ রাজ্যের সেকুলার ব্রিগেডকে রীতিমতো দর্পণের সম্মুখে দাঁড় করায়। রাজ্য জুড়িয়া গোরু, বালি, প্রস্তর, কয়লা পাচারচক্র অতিসক্রিয় হইয়া ওঠে। রাজ্য প্রশাসনের দ্বারা কেন্দ্র প্রদত্ত অর্থের ব্যাপক নয়ছয়, সর্বপ্রকার প্রশাসনিক দুর্নীতির কারণে আবাস লাভে বঞ্চিত হয় গ্রামীণ জনসাধারণ। তৃণমূলনেত্রীর শাসনাধীনে এই রাজ্যে 'দুর্নীতি' একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পাকা সড়ক নির্মাণে রাজ্য সরকারের গাফিলতির কারণে অদ্যাবধি সড়ক যোগাযোগ হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে এই রাজ্যের অসংখ্য গ্রামীণ জনপদ। আমফানের ন্যায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও সরকারি সাহায্য দরিদ্র মানুষের নিকট পৌঁছায়নি। বিপর্যয়-পীড়িত অঞ্চলসমূহে শাসক দলের নেতৃস্থানীয়গণ তাহা আত্মসাৎ করে। গণবন্টন ব্যবস্থাকেও দুর্নীতিচক্রের বাহিরে রাখে নাই মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দকৃত খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করে শাসক দল আশ্রিত দুর্বৃত্তবাহিনী। 'সিন্ডিকেট'- নামক অসামাজিক বেড়াজালের দ্বারা জলাভূমি, খেলার মাঠ দখল করিয়া বহুতল নির্মাণ-পূর্বক এই রাজ্যে এক ভয়াবহ মাফিয়ারাজ স্থাপন করিয়াছে শাসক দল। ২০১১-পরবর্তী পর্যায়ে শাসকের শাসন ও আচরণ ৩৪ বৎসরের বাম শাসনেরই ধারাবাহিকতা মাত্র। শিক্ষক নিয়োগে শাসকের দুর্নীতির কারণে প্রায় ২৬ সহস্র বিদ্যালয়-শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী এই রাজ্যে জীবিকাচ্যুত হইয়াছেন। শিক্ষকহীন ও ছাত্র-শূন্য হইবার কারণে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়সমূহ অন্ধকূপে পরিণত হইয়াছে। স্বাস্থ্য দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতির কারণে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা উপস্থিত হইয়াছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্রী ডাঃ অভয়া এই দুর্নীতি আঁচ করিবার মাত্র তাঁহাকে হত্যা করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সক্রিয় একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত। ব্যাপক লুঠতরাজের কারণে এই রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হইয়া থাকে। রাজ্যের শহর ও গ্রামাঞ্চলে নির্বাচন-পরবর্তী হিংসা, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের বলি হন বিরোধী দলের অসংখ্য কর্মী, সমর্থক। ধর্ম পালন, ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপনের অধিকারও এই রাজ্যের হিন্দুদিগের নাই। দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে নিষেধাজ্ঞা, শ্রীরামনবমীর শোভাযাত্রায় জেহাদি আক্রমণ এই রাজ্যে অহরহ হইয়া থাকে। শাসক দলের পোষ্য, মস্তকে সেকুলারিজম-জারিত তথাকথিত বুদ্ধিজীবীগণ শাসকের এহেন ভয়ংকর কার্যকলাপসমূহের বিষয়ে সর্বদা নীরবতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিগত ১৫ বৎসর যাবৎ শাসক দল বাঙ্গালি জাতির একাংশের দুর্বৃত্তায়ন ঘটানোর কারণে রাজ্যে আইনের শাসনের পরিবর্তে শাসকের আইন বলবৎ হইয়াছে। প্রায় ৮ লক্ষ কোটি টাকা দেনাগ্রস্ত অবস্থায় এই রাজ্যের অর্থনীতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্য-সহ যাবতীয় কর্মসংস্থানের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটায় অগণিত বাঙ্গালি যুবক ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকে পর্যবসিত হইয়াছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও 'আইপ্যাক'-নামক অলাতচক্রের হাতে পণবন্দি এই রাজ্যের দুরবস্থা বর্তমানে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছে নির্বাচন কমিশন ও সর্বোচ্চ আদালত। এইবারের বিধানসভা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা এবং নির্বিঘ্নে ভোটগণনার লক্ষ্যে প্রবলভাবে উদ্যোগী হইয়াছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে গণতন্ত্র এবং ভারতীয় সংবিধান-প্রদত্ত নাগরিক অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে ইহাই রাজ্যবাসীর নিকট অন্তিম সুযোগ। এমতাবস্থায় উক্ত সুযোগ সদ্ব্যবহার-পূর্বক এই কঠিন পরীক্ষায় তাঁহারা উত্তীর্ণ হইলে এবং রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইলে নৈরাজ্যের অবসান ও রাজ্যে সুদিনের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত।

সুভাষিতম্

অঙ্গেন গাত্রং নয়নেন বক্ত্রং, ন্যায়েন রাজ্যং লবণেন ভোজ্যম্।
ধর্মেন হীনং খলু জীবিতং চ, ন রাজতে চন্দ্রমসা বিনা নিশা।।

অর্থ ঃ অঙ্গহীন শরীর, চক্ষুহীন চেহারা, ন্যায়বিচারহীন রাজ্য, লবণহীন ভোজ্য এবং ধর্মহীনভাবে বেঁচে থাকা জীবন চন্দ্রহীন অন্ধকার রাত্রির মতো।

‘এসআইআর’ প্রমাণ করল বাম-তৃণমূলের ‘জল ভোটের’ ধোঁকা কেমন দেখতে

‘কণ্টকাকীর্ণ মার্গং’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এসআইআর -এর প্রভাব ২৯৪-এর মধ্যে ১৯০টি আসনে পড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জেতা ১১১ আর বিজেপির জেতা ৬৮ আসন। দু'টি ক্ষেত্রেই জয়ী দলের ভোট ব্যবধানের তুলনায় ভোটার বাদ পড়ার সংখ্যা দেড় থেকে দু'গুণ। তবে এ রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা সবচেয়ে করুণ ৭৪টি মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা আসনে। তার মধ্যে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের লিড নেওয়া ৫৪টি বিধানসভা আসন, বাম-কংগ্রেসের এগিয়ে থাকা ১২টি বিধানসভা আসন আর বিজেপির ৮টি বিধানসভা আসন রয়েছে। এসআইআর-এর গুঁতোয় ২০২৪-এ তৃণমূলের এগিয়ে থাকা ৫৪টির মধ্যে ৩৯টি আসনেই বিজেপি বা বাম-কংগ্রেসের থেকে তাদের জয়ের ব্যবধানের তুলনায় ভোটারদের নাম বাদের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণের বেশি। এসআইআর-এর পর এ রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ নাম বাদ পড়লেও সাত (৭) লক্ষ নতুন ভোটার যোগ হওয়ায় রাজ্যে মোট ভোটার বাদের সংখ্যা প্রায় ৮৪ লক্ষ। অর্থাৎ মোট ভোটারের প্রায় ১১ শতাংশ। সাধারণ কয়েকটি ভুলচুক থাকলেও নির্বাচন কমিশনকে বাহবা দিতেই হবে। জল ভোটের কাদা ঘেঁটে তারা বৈধ ভোটার বের করতে পেরেছে। নয়তো তৃণমূলের মতো একটি নীতিবিবর্জিত দলকে আয়নার সামনে ধরা যেত না।

২০২৪-এর লোকসভা ভোটের সময় ভিন্ন স্বাদে ‘রাজ্যপাট’-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রাজ্য ভোটে বিজেপি আর তৃণমূলের লড়াইটা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেছেন যে, রাজ্যে বিজেপি এবার বিপুল আসনে জিততে চলেছে। ফলাফল যাই হোক এটা নিশ্চিত সত্য যে, এ রাজ্যে বিজেপির জায়গাটা অনেকটাই বেড়েছে আর তৃণমূলের সমানভাবে কমেছে। ২০২১-এ ২৯০ আসনে ‘খোলা’ লড়াই হয়েছিল। এবারে সমীক্ষকরা বলছেন ভোটের দিন যত এগোচ্ছে লড়াইয়ের পরিধি ছোটো হয়ে আসছে। অর্থাৎ ২৯০-এর ওপর আসন থেকে কমে তা ৬০, তারপর ৩৮ আর এখন ১৮ আসনে এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ মূল লড়াই ১৮টি আসনে। আর ওই আঠারো আসনে যে প্রাধান্য পাবে সেই ভোট জিতবে। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী কেন বিজেপি-র বিপুল জয়ের দাবি রেখেছেন। যা তিনি সচরাচর করেন না । মানতেই হবে বিজেপি এবারে তাদের ভোটের লড়াইকে তীব্র থেকে তীব্রতম করে তুলেছে। তবে রাজনৈতিকভাবে পেশাদার বিজেপি মাঠ জুড়ে খেললেও তৃণমূলের মত একটি অপেশাদার অরাজনৈতিক দলকে খুব সহজে বেকায়দায় ফেলা কঠিন। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস কোনো সোজা পথের রাজনীতি করে না। ২০২১-এর পর থেকে ভোটকুশলী সংস্থা তাদের এই বাঁকা, অন্ধকার, অমসৃণ আর অপেশাদার পথের রাজনীতি শিখিয়েছে। মিথ্যা প্রচার আর চৌর্যবৃত্তির সহায় হয়ে সেই তস্কর-সদৃশ কৌশল তারা ব্যবহার করে থাকে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে সন্দেশখালিতে সেটাই দেখা গিয়েছিল। তৃণমূলের জন্মের ২০ বছর আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক চাষ শুরু করেছিলেন। ২০১১-তে ক্ষমতায় আসার পর তিই বিষবৃক্ষ পুঁততে শুরু করেন। ভেসে যাওয়া বাম-কংগ্রেসের পক্ষে তা ওপড়ানো ততটা সহজ নয় যতটা বিজেপির পক্ষে সহজ। জাতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির জন্ম ১৯৮০ সালে হলেও এ রাজ্যে তার উত্থান ২০১৪-র আগে নয় আর প্রতিষ্ঠা ২০১৯। বিজেপির জন্মের সময় থেকেই রাজনীতিতে তৃণমূলনেত্রীর প্রবেশ। তাই তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই সোজা হলেও বিজেপির পক্ষে অনেক আসনে জেতা কঠিন হতে পারে। বিজেপি যে সেই প্রস্তুতি নিচ্ছে তার হাবভাব দেখে সেটাই মনে হয়।

বিজেপির ইতিহাস হলো--- কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া। প্রায় তিন দশকের লড়াইয়ের পর তারা ওড়িশা ও দিল্লি দখল করে। ২০১৯-এর ভোটের আগে এ রাজ্যে বিজেপি প্রতিষ্ঠিত-বিরোধী দল ছিল না। আসন্ন ভোটে তারা প্রধান বিরোধী দল হিসাবে লড়ছে। তাই অনেকেই মেনে নিচ্ছেন যে বিজেপি তার পারফরম্যান্স দেখাতে পারবে। এবার তারা তৃণমূলের বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলতে পারবে। স্বাধীনতার পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মধ্যে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক স্থবিরতা রয়েছে। মনে হয় এটা যেন ‘না পাল্টানোর রাজ্য’! তাই ৩৪ বছর ধরে বিদেশি বামেদের অপশাসন মেনে নেওয়ার পর নতুন ভাবে পনেরো বছর ধরে তারা আরেক অশুভ শক্তিকে রাজ্যে ভর করে থাকতে দিয়েছে। এবার হয়তো তাকে ঝেড়ে ফেলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। সে সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় সে গুরুদায়িত্ব এ রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে পালন করতে হবে। ২০২১ ও ২০২৪ সালে এ রাজ্যে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ৮০ শতাংশের উপর ভোট পড়েছিল। ‘এসআইআর’ পরবর্তী পর্যায়ে এবার বেশি ভোট পড়তে পারে। ওই দু'বছর ভোট দেননি পশ্চিমবঙ্গের ১ কোটির ওপর ভোটার। সে ভোট ফিরলে কাঁটার রাস্তা সুগম হবে। অশুভর পতন হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

এত সোনা কার দিদি!

বিভ্রান্তেষু দিদি,

আপনাকে দেখে আমার ভালো লাগছে না। আপনি কোথাও গিয়ে নিশ্চিন্তে এক মিনিট কেন এক সেকেন্ডও দাঁড়াতে পারছেন না। মঞ্চের এ মাথা ও মাথা করে বেড়াচ্ছেন। সেই সঙ্গে কী বলছেন আর কী বলছেন না তা নিয়েও আমার খুবই চিন্তা। আসলে দিদি এমন বিভ্রান্ত হতে আপনাকে অতীতে দেখিনি। কেউ কেউ বলছে বিদায় নেওয়ার তাড়া লেগেছে আপনার। আর পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে তাতে একটা বড়ো মুশকিল কাজ হলো, কী যে লিখব তা। যাই লিখি না কেন এই চিঠি আপনার হাতে পৌঁছতে পৌঁছতে সব খবর বাসি হয়ে যেতে পারে।

তবে একটা স্থায়ী প্রশ্ন শুরুতেই করে নিই দিদি। আপনার মানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনয়নের সময় তাঁর প্রস্তাবক মিরাজ ডি শাহ এখন তদন্তের আওতায়। আয়কর দপ্তরের তল্লাশিতে আপনার মিরাজ ভাইয়ের বাড়ি থেকে বিদেশি হলমার্কযুক্ত ৮.০৮ কেজি সোনার বার উদ্ধার হয়েছে। সে তো অনেক দামী দিদি! কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এত সোনা কার? আপনার নয় নিশ্চয়ই।

আবার কাগজে পড়লাম, রাজ্যে আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার পর থেকে এই চিঠি লেখা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল বেআইনি অর্থ উদ্ধার হয়েছে। সঙ্গে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও বোমা উদ্ধারের কথাও জানিয়েছে কমিশন। ভোট ঘোষণার পরে রাজ্য থেকে নাকি দিদি, ৩২৭টি লাইসেন্স বিহীন আগ্নেয়াস্ত্র এবং ৫৩৯ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। এছাড়া, ১১১০টি বোমা এবং প্রায় ১২৯ কিলোগ্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে রাজ্য পুলিশ এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থা ও বাহিনী।

দিদি এমনিতেই রাজ্যে কোটিপতি প্রার্থীর নিরিখে এগিয়ে আপনার দল তৃণমূল। প্রথম দফায় ১৫২ জন প্রার্থীর মধ্যে ১০৬ জন কোটিপতি এবং ১৪৮ জনের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। পরের হিসেবটা পরে দেওয়া যাবে। সেটার গড় আরও বেশি হবে। কারণ, আসল ধনী মানে আপনার মন্ত্রী ভাইয়েরা তো সব কলকাতার দিকেই। আরও আছে দিদি। ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে হিসাব বহির্ভূত প্রায় ৪১৭ কোটি টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের হিসেব বলছে, গত ১৫ মার্চ আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি চালু হওয়ার পর থেকে গত ১৪ এপ্রিল রাত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা নগদ টাকা এবং 'নিষিদ্ধ সামগ্রী'র মোট অঙ্ক ৪১৬ কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), নার্কোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি), আয়কর দপ্তর, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, আরপিএফ (রেল রক্ষীবাহিনী)-এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের অভিযানে মোট ১৯৭ কোটি ৩৮ লক্ষ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, ৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মদ, ৯৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার মাদক, ৫২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার সোনা-সহ মূল্যবান ধাতু এবং প্রায় ১৭১ কোটি টাকার অন্যান্য সামগ্রী।

আপনি বলছিলেন শুনলাম— "তোমরা মাছেভাতে বাঙ্গালির মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছ। মাংস, ডিম খাওয়াও বন্ধ করে দিচ্ছ। তা হলে মানুষ কী খাবে! আমার মাথা না তোমার মাথা? মাথা চিবিয়ে খাবে?" সত্যিই দিদি কী চিবিয়ে খাওয়া যায় বলুন তো!

আমি আরও চিন্তায় আছি। সেদিন বললেন, 'আমার প্লেনে হানা করছেন। আমার নিরাপত্তাকর্মীদের উপর হানা দিচ্ছেন।' এর আগে বলেছিলেন আপনার হেলিকপ্টারের কাছে বিহারের লোক ড্রোন ওড়াচ্ছে। পরে সত্যটা জানা যায় যে ওরা তৃণমূলেরই লোক। গতবার তবু পা ভেঙেছিলেন। কিন্তু এবারে কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলছে, ইচ্ছা থাকলেও কিছু ভাঙা যাচ্ছে না। তাই নাকি আপনি অন্য রাস্তায় গিয়ে প্রচার করছেন যে, বিজেপি এলে মাছ-মাংস বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি বলছিলেন শুনলাম— "তোমরা মাছেভাতে বাঙ্গালির মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছ। মাংস, ডিম খাওয়াও বন্ধ করে দিচ্ছ। তা হলে মানুষ কী খাবে! আমার মাথা না তোমার মাথা? মাথা চিবিয়ে খাবে?" সত্যিই দিদি কী চিবিয়ে খাওয়া যায় বলুন তো! □

ইসলামি রাজনীতির অ আ ক খ

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

মুসলমানেরা ভারতে আসার পর থেকে এই উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কলহ এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিত্যকার ঘটনা। কোনো সাম্প্রদায়িক কলহের পর হিন্দু ও মুসলমান, দুই পক্ষ আর কলহ না-করার শপথ নেয়, কিন্তু কিছু দিন বাদে আবার তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়,এই বার হয়তো আগের চেয়ে আরও বেশি মাত্রায়। এর কারণ জানলে নিত্যকার কলহ রোধ করা যেত।

কোরান বিচ্ছিন্নতাবাদ ও দ্বিজাতিতত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করে : কোরান মুসলমানদের চিন্তাধারা তৈরি করে, অপর পক্ষে বেদাদি গ্রন্থ হিন্দুদের। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলেছে— 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমার প্রতিবেশী যে-ধর্মের লোক হোক তাকে ভালোবাসো। কিন্তু কোরান বলছে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা— মুসলমানেরা মুসলমান ছাড়া কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। যারা অমুসলমান তারা কাফের অর্থাৎ বিধর্মী। তারা মুসলমানদের অধীনে ক্রীতদাস হিসেবে থাকবে। কোরান পৃথিবীকে দুটো ভাগে ভাগ করেছে--- দার-উল-ইসলাম (মুসলমানদের পৃথিবী) ও দার-উল- হারব (যুদ্ধের পৃথিবী)। সাচ্চা মুসলমানদের কাজ হবে গোটা পৃথিবীকে ইসলামের অধীনে আনা। কোরানে বিচ্ছিন্নতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। সৈয়দ আহমদ ও পরে জিন্না যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেছিলেন তখন গান্ধীজী-সহ ভারতীয় নেতারা অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু তারা যদি ইসলামের অ আ ক খ জানতেন, তাহলে অবাক হতেন না। সে-রকমই মুসলমান নেতাদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান দাবির জন্য আন্দোলন মোটেই আশ্চর্য হওয়ার বিষয় নয়। কোরানের প্রধান নির্দেশ— মুসলমানেরা মুসলিম অধ্যুষিত দেশে থাকবে যেখানে শরিয়তি নিয়ম চালু থাকবে। মুসলমানদের কাছে পৌত্তলিক, খ্রিস্টান, ইহুদি সবার একমাত্র পরিচয় হলো— ইসলামে অবিশ্বাসী। কোরান মুসলমানদের অমুসলমানদের থেকে শুধু আলাদা থাকতে বলে না, তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অর্থাৎ যুদ্ধ করে ইসলাম গ্রহণ করানোর কথা বলে। কোরানের নির্দেশ--- 'অবিশ্বাসীদের যেখানে পাও হত্যা করো।' (২/১৯০-১৯১); 'ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।'(৯/১৪; ৯/৭৩) 'আমরা অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি করব।'(৩/ ১৪৯-৫১; ৮/১২) 'মন্দির দেখলে ধ্বংস করবে।'

ইসলাম অশান্তির মজহব : মুসলমানেরা বলে, ইসলাম শান্তির মজহব। কিন্তু কোরানে কোথাও শান্তির কথা নেই। মহম্মদ নতুন উপাসনা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যদি বলতেন যে যে যার মত-পথ, উপাসনা পদ্ধতি পালন করুক তাহলে অশান্তি হতো না। কিন্তু তিনি তার মজহব গ্রহণ করাতে অন্যদের বলপ্রয়োগ করার জন্য নিরন্তর যুদ্ধ করেছিলেন। প্রসঙ্গত, নবিজী রমজান মাসে মুসলমানদের এক মাস রোজা রাখতে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া ও হত্যা করা। (৯/৪) কোরানে ১২০ বার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে। লজ্জার বিষয় রমজান মাসে এক মাস উপবাসের শেষে যেখানে অমুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে সেখানে অমুসলমানরা 'ইদ মুবারক' বলে মুসলমানদের কোলাকুলি করেন এবং সানন্দে ইফতারে অংশ গ্রহণ করেন। কোরান যেন যুদ্ধের বই। মহম্মদ তার ৬২ বছরের জীবনকালে ২৭ বার যুদ্ধ করেছেন (গোলাম মোস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ-৪২৩)। 'যুদ্ধই' যেন ইসলামের মজহব। ফলে ইসলাম সফল প্রশাসন চালু রাখতে পারেনি। খলিফাদের শাসনকালও যুদ্ধ করে কেটেছে।

ইসলামে মানবাধিকার নেই : মহম্মদ বলেছিলেন ইসলামের উদ্দেশ্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে সমতা স্থাপন। তার অনুবর্তীরা বলে থাকেন ইসলাম অন্য উপাসনা পদ্ধতির তুলনায় মানবিক। কিন্তু মহম্মদের ইসলামে তার কোনো প্রমাণ নেই। প্রথমত, তিনি খ্রিস্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক ইত্যাদি কোনো ধর্মের মহত্ত্ব স্বীকার করেননি। তার মতে অমুসলমানেরা 'ঘৃণ্যতম জীব' (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-১১)। তার নির্দেশ ছিল কোনো মুসলমান— খ্রিস্টান বা ইহুদিকে হত্যা করলে তার যথোপযুক্ত শাস্তি হবে না। কিন্তু খ্রিস্টান বা ইহুদি ওই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার শাস্তি হবে (আনোয়ার শেখ—ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-১৭)। শুধু তাই নয়, ফৌজদারি বিচারের ক্ষেত্রে ইহুদি, খ্রিস্টান বা হিন্দুর সাক্ষ্য গৃহীত হবে না (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-১৭)। মহম্মদ-প্রবর্তিত ইসলামে মানবাধিকার বলে কোনো কথা নেই। অমুসলমানরা মুসলমান-শাসনাধীনে থাকতে চাইলে তাঁদের জিজিয়া কর দিতে হবে। এছাড়া অমুসলমানদের আরও অনেক অপমানজনক নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যেমন, তাদের মুসলমানদের থেকে আলাদা দেখানোর জন্য বিশেষ পোশাক পরতে হবে, বাড়ির বিশেষ রং বা চিহ্ন দিতে হবে, ঘোড়ায় চড়া বা অস্ত্র নিয়ে চলা নিষিদ্ধ (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-১৮-১৯)। মহম্মদ সাহাবিদের ইহুদি জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নির্মূল করার কথা বলেছিলেন। তার নির্দেশ মেনে ইসলামি দেশগুলি সেই ১৪০০ বছর ধরে ইহুদি উপাসনা পদ্ধতিকে ধ্বংস করার কথা বলে আসছেন। একটি জাতিকে ধ্বংস করার ভাবনা কতটা অমানবিক তা চিন্তনীয়।

মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব : মহম্মদ মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার স্বপ্ন সফল হয়নি। হিন্দুরা চতুর্বর্ণে বিভক্ত হলেও তাদের মধ্যে কদাচিৎ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হতো, কিন্তু মুসলমানরা মহম্মদের মৃত্যুর কয়েকশো বছরের মধ্যে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হয়েছিল। যেমন, শিয়া, সুন্নি, আহমদিয়া,

মাজহাবি, দেওবন্দি, ওয়াহাবি, হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি, আহলে হাদিস, নামাজ হাবি, মুতাজিলা খারিজি, সুফি ইত্যাদি। এই সম্প্রদায়গুলি নিজেদের সাচ্চা মুসলমান হিসেবে দাবি করে সব সময় নিজেদের মধ্যে মারদাঙ্গায় লিপ্ত হয়। ভাবতে আশ্চর্য লাগে ৫৩টি মুসলমান দেশ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ ঘোষণা করেও সবসময় ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত।

ইসলামে নারীদের সম্মান নেই : মুসলমানরা বলে থাকে ইসলাম নারীদের পুরুষদের সমান মর্যাদা দিয়েছে। অন্য বিষয়ের মতো এটি মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছু নয়। নবিজী পুরুষদের চারটি বিবাহ, তিন তালাক, বোরখা পরে মুখ ঢাকা, মহিলাদের বাইরে না বের হওয়া এবং তাদের পড়াশোনা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সব বিধানের অর্থ নারীরা পুরুষদের অধীন ও তাদের কোনো স্বাতন্ত্র্য থাকবে না। ইসলামে পুরুষদের চারটি স্ত্রী রাখার বিধান থাকলেও পুরুষেরা খুশিমতো আরও বিয়ে করতে পারত। নবীজীর পৌত্র হাসানের ৭০টি স্ত্রী ছিল (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-২৭)। স্বামী যৌন সম্ভোগ চাইলে তার স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাড়া দিতে হবে (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-৩০)। স্ত্রী অবাধ্য হলে তাকে মারার অধিকার স্বামীর আছে। এবং শেষ বিচারের দিন স্ত্রীকে শারীরিক পীড়নের জন্য কোনো কৈফিয়ত চাওয়া হবে না (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-৩২)। ইসলামে নারীকে পুরুষের অধীন শুধু নয়, 'শয়তানী' বলে (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-২৯) উল্লেখ করা হয়েছে। নবীজী যুদ্ধে পরাজিত বিধর্মীদের স্ত্রীদের ধর্ষণ করে তাদের বিবাহ করার অধিকার এমনকী বিক্রি করার অধিকার দিয়েছিলেন। (আনোয়ার শেখ— ইসলাম অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স্, পৃ-৪৪)। এই মানসিকতার শরিক হয়ে ইসলামপ্রেমিকরা কী করে বলেন, ইসলাম নারীকে গভীর উচ্চতার আসন দিয়েছে?

ইসলামি আধিপত্যবাদ : ইসলামে জোর দেওয়া হয়েছে আধিপত্যবাদের ওপর। মুসলমানেরা মনে করেন এই পৃথিবী আল্লার সৃষ্টি এবং মুসলমানেরা তার সন্তান। সেই হিসেবে সারা বিশ্বের উপর মুসলমানদের অবিসংবাদিত অধিকার। কবি মহম্মদ ইকবালের কথায়; 'চীন-ও-আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা, মুসলিম হ্যায় হাম, সারা জাহাঁ হামারা।' (গোলাম মোস্তাফা, বিশ্বনবী, পৃ-১৪৯)। এই ভাবনায় ভাবিত মুসলমানেরা বিভিন্ন দেশের স্থানীয় আইন না মেনে পৃথিবীর সর্বত্র তাঁরা মসজিদ, মক্তব, মাদ্রাসা ও অন্যান্য স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন। ১৯৫০ সালে মাও-সে-তুং লক্ষ্য করেছিলেন যে, চীন যখন ১৯৩০-৪০-এর দশকগুলিতে জাপানের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল, তখন মুসলিমরা জিনজিয়াং থেকে দলে দলে চীনে অনুপ্রবেশ করে মসজিদ ও ঘরবাড়ি নির্মাণ করে ফেলেছে। মুসলিম দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধ হলে মুসলিম শরণার্থীরা দলে ইউরোপ আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি প্রভৃতি দেশ তাদের আশ্রয়-সহ শিক্ষা, চাকরি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু এই শরণার্থী মুসলমানেরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর হয়ে আশ্রয়দানকারী দেশের সরকারের কাছ থেকে কোনো অনুমতি না নিয়ে বেআইনিভাবে মসজিদ, বাড়ি ইত্যাদি বানান; মসজিদ থাকা সত্ত্বেও রাস্তা জুড়ে নামাজ পড়েন, প্রবল জোরে মাইক বাজিয়ে আজানের ডাক দেন । ২০০০ সালের প্রথম দিকে দিল্লির এক উচ্চপদস্থ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছিলেন, মুসলমানেরা দিল্লির ১১৬টি জায়গায় বেআইনি নির্মাণ করেছেন। একদা ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকরউদ্দিন আলি আহমেদ রাষ্ট্রপতি ভবনের লাগোয়া বিশাল মসজিদ বানিয়েছিলেন। তার জন্য সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া হয়নি। উত্তরপ্রদেশ সরকার জানিয়েছে যে, মুসলমানরা আইন না মেনে ৫,০০০টি ক্ষেত্রে মসজিদ, মক্তব, বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণ করেছে। সরকার নোটিশ দিলে মুসলমানেরা কোনো জবাব দেয় না।

মুসলিমদের লক্ষ্য সারা পৃথিবীর ইসলামীকরণ : আরেকটি বিষয় হলো মুসলমানেরা যে-দেশে যান সে-দেশকে তারা নিজেদের অধিকারভুক্ত দেশ বলে মনে করে এবং সেদেশের মূল অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলো ছিন্নমূল মুসলিমদের তাদের দেশে স্থান দিয়েছিল। সেজন্য কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক সে-দেশকে মুসলিম দেশে পরিণত করার চেষ্টাও করেছে মুসলমানরা। ব্রিটেনে যে যে এলাকায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে তারা শরিয়তি শাসন চালু করছে, ব্রিটিশ পতাকা সরিয়ে ইসলামিক পতাকা লাগাচ্ছে, ইসলাম প্রচার করছে এবং মসজিদ থেকে নিয়মিত ব্রিটেনকে মুসলিম দেশে পরিণত করার ডাক দিচ্ছে। ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে একই পদ্ধতিতে সেই দেশগুলির দ্রুত ইসলামিকরণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উত্তর আমেরিকায় মুসলিম মৌলবি ও রাজনৈতিক কর্মীদের লক্ষ্য একই— দ্রুত আমেরিকার ইসলামীকরণ। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে আমেরিকার একজন মুসলমান লিখেছে—'ধর্মান্তর করো। জিজিয়া দাও নয়তো মরো। কয়েক বছরের মধ্যে আমেরিকা অধিগ্রহণ করো।' ইতালিতে একজন মৌলবি কিছুদিন আগে ঠিক একই কথা বলেছেন, যার প্রতিক্রিয়ায় ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি তাকে ইতালি ত্যাগে বাধ্য করেছেন। ভারতে অন্তত এক ডজন মুসলিম উগ্রবাদী সংগঠন ভারতকে মুসলিম দেশে পরিণত করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই উদ্দেশ্যে তারা অবিরত মারদাঙ্গা করে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ভারত সরকারের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ভারতে যখনই কোনো ধর্মীয় শোভাযাত্রা হয় মুসলমানেরা সেটিকে আক্রমণ করে দাঙ্গা তৈরি করে। জেহাদ বা দাঙ্গার উদ্দেশ্য হল দার-উল-ইসলামের ধারণাকে বাস্তব রূপ দিতে মুসলমাদের লড়াকু করা।

ইসলামে জেহাদ ও দাঙ্গার স্থান : পৃথিবীর সব দেশে মুসলমানরা মারদাঙ্গা করে থাকে। কিন্তু দাঙ্গার দায় চাপায় অন্য পক্ষের ওপর। তাদের তৈরি দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত দল যখন প্রতিআক্রমণ করে, তখন মুসলমানেরা তাদের দোষী সাব্যস্ত করে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর প্যালেস্তিনীয়রা হঠাৎ ইজরায়েল আক্রমণ করে কয়েকশো নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে ও নারী ও শিশু-সহ আরও কয়েকশো মানুষকে পণবন্দী হিসেবে নিয়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গাজা আক্রমণ করে ইজরায়েল। প্যালেস্তিনীয়রাও সন্ত্রাসবাদী হামাস, হেজবোল্লাদের সাহায্যে পাল্টা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। এই যুদ্ধে শত শত

প্যালেস্তিনীয়দের মৃত্যু ঘটেছে। মুসলমানরা তখন ইজরায়েলকে গণহত্যার দায়ে দায়ী করে। অথচ জেহাদি প্যালেস্তিনীয়দের বিরুদ্ধেই গণহত্যার দায় চাপানো উচিত। কারণ তারাই প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে। প্যালেস্তিনীয়রা যুদ্ধ স্থগিত করার পরও যদি ইজরায়েল যুদ্ধ চালিয়ে যেত তাহলে ইজরায়েলকে যুদ্ধাপরাধী বলা যেত। ভারতে ২০০২ সালে এক জন কংগ্রেসি মুসলিম নেতার উদ্যোগে গোধরা স্টেশনে সবরমতী এক্সপ্রেসে অগ্নিসংযোগের দ্বারা ৪৯ জন করসেবককে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হয়। এই জঘন্য কাজের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় গুজরাতে দাঙ্গা হয়। মুসলমানদের চিরাচরিত নীতি অনুযায়ী তারা গুজরাত দাঙ্গার দায় বিজেপি দলের ওপরে চাপিয়ে দেয়;কখনও গোধরায় ট্রেনের কামরায় অগ্নিসংযোগের জন্য তারা লজ্জা প্রকাশ করেনি। এই রকমই কলকাতায় ১৯২৬, ১৯৪৬, ১৯৪৭-এর দাঙ্গা, নোয়াখালীর দাঙ্গা, ১৯৯০ সালে কাশ্মীরে গণহত্যার জন্য মুসলমানেরা কোনো দুঃখ প্রকাশ করেনি। আরও মজার বিষয় হলো মুসলমানরা অপরাধ করলে লজ্জিত বা দুঃখিত হওয়া দূরের কথা তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে সরকারের নির্দেশের বিরোধিতা করে। কিছু দিন আগে বিহারের এক মৌলানা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর মায়ের সম্বন্ধে কুৎসিত মন্তব্য করে। উত্তরপ্রদেশ সরকার তাকে গ্রেপ্তার করলে গোটা উত্তরপ্রদেশের মৌলানারা বিহারের মৌলানাকে তিরস্কার করা দূরে থাক, রাস্তায় নেমে ওই অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিক্ষোভ করতে থাকে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মোথাবাড়ি ব্লক অফিসে মোফাক্কেরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৭ জন বিচারককে আটক করে রাখা হয়, তাঁদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। তাকে পরে পুলিশ গ্রেপ্তার করলে স্থানীয় মুসলমানরা তাকে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে। মুসলিমরা কখনও তাদের দোষ স্বীকার করে না। ফলে যে দেশে তারা থাকে সে-দেশের আইনকে তারা বুড়ো আঙুল দেখায়।

ইসলামোফোবিয়া : মুসলমানদের আধিপত্যবাদের উপর আজ পৃথিবীর সমস্ত অমুসলিমদেশের মানুষ অসন্তুষ্ট। আধিপত্যপ্রিয় মুসলমানদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের পূজাস্থান ভাঙা, সরকারের থেকে অনুমতি না-নিয়ে বেআইনিভাবে মসজিদ ও বাড়ি নির্মাণ করা, অমুসলমানদের পূজাস্থান ঘেঁসে মসজিদ বানানো, বিধর্মীয় শোভাযাত্রা আক্রমণ করা, রাস্তা অবরোধ করে এমনকী সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত এলাকায় নামাজ পড়া, প্রকাশ্যে অমুসলিম দেশে ইসলামিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিমদের সংগঠিত করা, অমুসলিম দেশের আইন না-মানা, সন্ত্রাসীদল তৈরি করা ইত্যাদি কাজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলে মুসলমানেরা সাবধান হওয়া দূরে থাক তাকে 'ইসলামোফোবিয়া' আখ্যা দিয়ে স্থানীয় সরকার ও জনতাকে তাদের প্রতি অসহিষ্ণুতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। মুসলমানেরা সর্বদা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিন্দা করে থাকে, বিশেষত ভারতের এক লক্ষেরও বেশি মসজিদ থেকে প্রতি জুম্মার নামাজের পর ইমাম খুতবার ভাষণে হিন্দু দেব-দেবীর নিন্দা করেন, কিন্তু হিন্দুরা যদি নবীজীর বিরুদ্ধে অনুরূপ নিন্দা করেন তাহলে তারা ঘৃণা ভাষণ বা 'হেট স্পিচ'-এর অভিযোগ আনেন যা কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। শুধু তাই নয় তারা নিজের হাতে আইন পর্যন্ত তুলে নেন। কয়েক বছর আগে নূপুর শর্মার সঙ্গে একটি সভায় একজন মুসলমান আলেমের বিতর্কের সময় মুসলমান আলেমটি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি কুৎসিত মন্তব্য করেন। তখন নূপুর শর্মা একটি হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে, মহম্মদ তো নয় বছর বয়সী আয়েশাকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর এই উদ্ধৃতিদানে ক্রুদ্ধ হয়ে এক মুসলমান ঘাতক নূপুর শর্মাকে হত্যা করতে আসে। নূপুর শর্মাকে না-পেয়ে অন্য দুজনকে হত্যা করে। অথচ নূপুর শর্মা মহম্মদ সম্বন্ধে কোনো কপোলকল্পিত উক্তি করেননি। হাদিসে এর উল্লেখ রয়েছে। মোট কথা মুসলমানেরা হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদিদের উপাস্য সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবেন কিন্তু ইসলাম, বিশেষত মহম্মদ সম্বন্ধে অন্যরা কেউ কোনো সত্যি কথা বলতে পারবেন না।

মুসলমানদের অমুসলিম দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ : মুসলমানরা কোনো মতেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে অমুসলমানদের থাকতে দেন না, সে দেশের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া তো দূর। অথচ তারা অমুসলিম দেশের উদারবাদের সুযোগ নিয়ে তারা সে-দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সে-দেশটিকে যত দ্রুত সম্ভব ইসলামিক দেশ করে তোলাই হয়ে ওঠে তাদের লক্ষ্য। এই গোপন এজেন্ডা নিয়ে তারা সে-দেশের এমএলএ, এমপি, মেয়র এমনকী মন্ত্রী ইত্যাদি পদ অধিকার করেন এবং সে-দেশের নেতাদের ওপর মুসলিম অ্যাজেন্ডা গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেন। আমেরিকা, ব্রিটেনের মতো ভারতে তারা কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী দল, আরজেডি, এনসিপি, কমিউনিস্ট পার্টি, আম আদমি পার্টি, ডিএমকে ইত্যাদি রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়ে সেই দলগুলিকে মনে-প্রাণে ইসলামিক করতে সফল হয়েছেন।

এই দলগুলি মুসলিম দলগুলিকে খুশি করতে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতা করছে, আমেরিকা-ইরান যুদ্ধে ইরানকে সমর্থন দিচ্ছে, মুসলিম শাসকদের গুণগান করে ইতিহাস রচনা করছে, হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি তথা দেব-দেবীর বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্গিরণ করছে, হিন্দুরাষ্ট্রের বিরোধিতা করছে; মোট কথা ভারতকে তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী মুসলমানরা গাজওয়া-ই-হিন্দ করতে চলেছে।

উপসংহার : মুসলমানরা তাদের এই মানসিকতার জন্য পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাছে নিন্দিত হয়েছেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন বলেছিলেন, যতদিন কোরান আছে ততদিন পৃথিবীতে শান্তি নেই। মোহনদাস গান্ধী বলেছিলেন, 'যে-তরবারির সাহায্যে ইসলামের সৃষ্টি ও প্রসার সেই তরবারি এখনও ইসলামের মূল শক্তি। ইসলামের অর্থ যদি হয় শান্তি;তবে এই তরবারি ত্যাগ করতে হবে।' (ইয়ং ইন্ডিয়া, ৩০ ডিসেম্বর, ১৯২৭)। ইতিহাসবিদ যদুনাথ সরকার লিখেছিলেন, 'যে মজহব তার অনুগামীদের শিক্ষা দেয় (অমুসলমানদের) হত্যা, ধ্বংস ও লুণ্ঠন হলো পবিত্র মজহবি কর্তব্য; সে মজহব মানব প্রগতি ও বিশ্বশান্তির চরম শত্রু।' (হিস্ট্রি অফ ঔরঙ্গজেব, ৩য় খণ্ড)। চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং বলেছেন, 'ইসলাম কোনো ধর্ম নয়। মানসিক রোগগ্রস্ত এক শ্রেণীর কাছে এটি ধর্ম। দুঃখের বিষয় আমরা এই কঠোর সত্য সম্বন্ধে উদাসীন। ফলে আমরা বুঝতে চাইছি না ভারতীয় মুসলমানরা কী অব্যাহত গতিতে ভারতকে দ্রুত 'গাজওয়া-ই-হিন্দ' করতে চলেছে। ▫

পশ্চিমবঙ্গের নৈরাজ্যের অবসানে এবারের বিধানসভা নির্বাচন বাঙ্গালির কাছে এক অগ্নিপরীক্ষা

বর্তমান ভারতের সংস্কৃতির পথে যতটা না অন্তরায় মাওবাদী বা জেহাদি আন্দোলন, তার থেকে বেশি ক্ষতিকারক গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত, গণতন্ত্র রক্ষার শপথ গ্রহণকারী তৃণমূল দলটি, যা সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে বেরিয়ে এসেছে।

খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

এই নিবন্ধটি লিখতে গিয়ে হীরক রাজার দেশের 'কতই রঙ্গ দেখি দুনিয়ায় ও ভাইরে ভাই, দেখে অবাক হয়ে যাই' অথবা মান্না দের গাওয়া 'একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনিতো আগে' মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ ভোট বঙ্গে বঙ্গেশ্বরীর নানা রঙ্গ প্রতিভার কথাই বলা হচ্ছে। সরাসরি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে অবতীর্ণ না হলেও ছাত্র-রাজনীতিতে সক্রিয়তা এবং গত সাত দশক ধরে দুই বঙ্গে রাজনীতির উথাল-পাথাল পর্যবেক্ষণ যারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব যে--- তৃণমূলনেত্রীর পরস্পর বিরোধী ভাষ্য বিশ্লেষণের দ্বারা একটি ধারাবাহিকতা উঠে আসে, তা হচ্ছে তীব্র হিন্দুবিরোধী ও জাতীয়তা বিরোধী মনোভাব এবং ক্ষমতা ধরে রাখতে অর্ধসত্য ও মিথ্যার আশ্রয়ে প্রয়োজনে প্ররোচনা দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে স্বকার্য সিদ্ধ করা। তিনি শুধু বিপরীতধর্মী বাক্যালাপ নয়, নিজস্ব কায়দায় নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলীকে খুশি করতে ভেক ধারণ করতে পারেন নির্দ্বিধায়। সাংবিধানিক পদে থেকেও ইডি তল্লাশির সময় আইপ্যাকের অফিসে ঢুকে ফাইলপত্র ছিনিয়ে নিয়ে স্বমহিমায় হাঁটতে পারেন। আবার নিজাম প্যালেসে হানা দিয়ে সিবিআই-এর কবজা থেকে ফিরহাদ হাকিমদের বের করার চেষ্টা তাঁর রুচি বা পদমর্যাদায় বাধে না। সিএএ আইনটিকে কার্যকর করতে বাধাদানের ক্ষমতা বা অধিকার তার না থাকলেও, রাজপথ গরম করেন 'ক্যা-ক্যা, ছি ছি' ধ্বনিতে, মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করতে। ভ্যানিশ কুমার (মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নামের বিকৃতি ঘটিয়ে এভাবে ব্যঙ্গ করে থাকেন তৃণমূলেশ্বরী) সুপার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে তার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছেন বলে জনসভায় দাবি করেও তিনি অকপটে বলতে পারেন আমার সিআইডি মোথাবাড়ি কাণ্ডে বিচারক অবরোধ ও হেনস্থার মূল অভিযুক্ত মোফাক্কেরুল ইসলাম এবং আক্রামুল বাগানিকে গ্রেপ্তার করেছে। সুপ্রিম কোর্ট যখন পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে বলে মন্তব্য করে, তখন আতঙ্কিত তৃণমূলনেত্রী রাষ্ট্রপতি শাসন জারির চক্রান্ত খোঁজেন, অথচ তিনিই বলেন ভ্যানিশ কুমার পশ্চিমবঙ্গে 'সুপার এমার্জেন্সি' জারি করেছেন। এই ধরনের দ্বিচারিতা ও পরস্পরবিরোধিতা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনীতির চাবিকাঠি। এটাকে অনেকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিলেও এই প্রতিবেদকের মতে নির্দিষ্ট অভিপ্রায়ে, জেনে বুঝে তিনি এই ধরনের পাগলামি করেন। আড়াই লক্ষ কেন্দ্রীয় বাহিনী পশ্চিমবঙ্গে এসেছে--- এতে কর্মী এবং সমর্থককুল যাতে ভয়ে মুষড়ে না যান তাই নির্বাচনী সভা থেকে মা-বোনেদের বলেন, বুট পায়ে মটমট করে যারা আসবে (কেন্দ্রীয় বাহিনী), তাদেরকে কটমট করে চোখ দেখাতে এবং বাড়িতে ঝাঁটা রাখার নিদান দিয়ে সমর্থকদের উজ্জীবিত করেন। একজন প্রার্থী যদি এভাবে হিংসার নিদান দিয়ে ছাড় পেয়ে যান তাহলে ভোটে হিংসা কীভাবে রোখা যাবে? তৃণমূলনেত্রীর এই ধরনের বক্তব্যকে নেহাত পাগলামি না ভেবে এতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় যাতে শেক্সপিয়রের হ্যামলেটের চরিত্রের সাদৃশ্য রয়েছে অর্থাৎ 'মেথড্ ইন ম্যাডনেস্'।

দেড় দশকের তৃণমূল শাসনে পশ্চিমবঙ্গের অচলায়তনের অবসান কীভাবে হবে তা নিয়ে বিরোধী রাজনীতিতে আলোচনা চলছে। অনেকে তাদের রাজনৈতিক ফসল তুলতে তৃণমূলনেত্রীর মুসলমান ভোটব্যাংকে ধস নামার আশায় আছেন। যদিও ২০১৬ সাল থেকে ব্যাপক দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের জন্য জনসমর্থন হারিয়ে তৃণমূলনেত্রী রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন এবং মুসলমান ভোট ব্যাংকে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন। জেহাদিদের নানা সুবিধা দানের মাধ্যমে তথা তাদের অপরাধ প্রবণতাকে উৎসাহিত করে একদা অনুপ্রবেশ-বিরোধী তৃণমূলনেত্রী ক্ষমতার লালসায় অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংকে যুক্ত করার কৌশল নিয়েছেন। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট শহিদ মিনারে সুরাবর্দি জেহাদিদের উদ্দেশে ঘোষণা করেন--- 'আপনারা যে কোনো অ্যাকশন গ্রহণ করতে পারেন পুলিশ আপনাদের বাধা দেবে না', যার পরেই রক্তক্ষয়ী জেহাদ শুরু হয় কলকাতা জুড়ে। তৃণমূলনেত্রী নির্বাচনী সভায় যখন বলেন--- 'কয়েকটা দিন সামলে থাকুন, ৪ মে-র পরে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বুঝে নেবেন', তখন কি তাঁর কণ্ঠে সুরাবর্দির প্রতিধ্বনি শোনা যায় না? আবার হিন্দুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চার করে নিজস্ব ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি বলেন, 'আমরা চলে গেলে ওই সম্প্রদায়ের এক মিনিটও লাগবে না আপনাদের শেষ করতে, অতএব সাবধান!'

এ রাজ্যের মুসলমানরা কেন ভাববেন না? পার্শ্ববর্তী অসম, ওড়িশা, বিহার রাজ্যে প্রচুর মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক নিরাপদেই রয়েছেন সেকথা? আর যদি অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের তাড়ানোর কথা বলা হয় তাতে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা কোথায়? আসল সমস্যা হচ্ছে মোল্লাবাদী 'মব পলিটিক্স' দ্বারা মালদার মোথাবাড়ি বা মুর্শিদাবাদের সুতি-সামশেরগঞ্জের মত ঘটনা ঘটানো যায় মুহূর্তের প্ররোচনায়। এ সমস্ত রাজনীতি বাস্তব লাভ-লোকসানের যুক্তি দিয়ে তাড়িত হয় না, ভাবাবেগে আন্দোলিত হয়। যেমনটা হয়েছিল ১৯৪৭ সালের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' আন্দোলনে মুসলিম লিগের ভয়াবহ প্ররোচনার মাধ্যমে। বর্তমান ভারতে বসবাসকারী প্রায় ২০ কোটি মুসলমানদের পূর্বপুরুষের ৯০ শতাংশ পাকিস্তানের জন্য ভোট দিয়েছেন। তাতে তাদের বর্তমান প্রজন্মের কতটুকু লাভ হয়েছে শুধু হিন্দু-মুসলমান বৈরিতা এবং অজানা অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা ছাড়া? অথচ কংগ্রেসে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফফর খানের মত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিলেন যারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমন্বিত অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছেন এবং অন্ধ মোল্লাবাদীদের কাছে তাঁরা পরাস্ত হয়েছেন। তাই অনেকের ধারণা এ রাজ্যের ৩০ শতাংশ মুসলমান ভোটের গরিষ্ঠাংশ তৃণমূলনেত্রীর পক্ষেই যাবে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে। মোল্লাবাদী ও জেহাদিরা যতই চেষ্টা করুক, ভারত সরকার কঠোর হলে যেকোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশবিরোধী শক্তিকে মুহূর্তে উড়িয়ে দিতে পারে, একথা সকলেই বোঝে। দেশজুড়ে মাওবাদী দমন তার প্রমাণ।

বর্তমান ভারতের সংস্কৃতির পথে যতটা না অন্তরায় মাওবাদী বা জেহাদি আন্দোলন, তার থেকে বেশি ক্ষতিকারক গণতান্ত্রিক পথে নির্বাচিত, গণতন্ত্র ও ভারতীয় সংবিধান হত্যাকারী তৃণমূল দলটি, যা সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে বেরিয়ে এসেছে। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, সরকার বিরোধিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতা সবসময়ই ভিন্ন বস্তু। কখনো কখনো এ দু'টি একে অপরের পরিপূরক। সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপের আগে জম্মু-কাশ্মীরের রাজনীতি তার সাক্ষ্য বহন করে। সাংবিধানিক পদে থেকে যখন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেন 'পশ্চিমবঙ্গকে টার্গেট করলে আমি ইন্ডিয়াকে হেলিয়ে দেব' বা 'পাকিস্তানি মিসাইল কলকাতায় পড়লে আমি দিল্লি উড়িয়ে দেবো', তখন এ জাতীয় বক্তব্যের প্রেক্ষিত যাই হোক না কেন, তাতে নিশ্চয়ই পাক-জেহাদিদের প্রকাশ্য আস্ফালনের গন্ধ পাওয়া যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক স্পর্শকাতর অবস্থানে, বিশেষত হাসিনা সরকারের বিদায়ের পরে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সংসদ নির্বাচনে ভারত সীমান্ত পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে ভারত বিরোধী জামাতিদের ৭৭টি আসন পাওয়া--- একটি সুস্পষ্ট অশনি সংকেত। মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবিরের উত্থান এবং ওয়েইসি সংযোগের সঙ্গে জামাত যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সাংবিধানিক তথা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির স্বাধীনভাবে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি এবং মোল্লাবাদের উত্থান রোধে তথা নাগরিক সুরক্ষা ও জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় এ রাজ্যে একটি দেশপ্রেমী, দুর্নীতিমুক্ত, জাতীয়তাবাদী দলের ক্ষমতায়ন দরকার। একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত এবং তা পূরণে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কতটা সফল হবে তা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের মনে এখনও কিছুটা সংশয় রয়েছে। কালিয়াচকের মোথাবাড়িতে বিডিও অফিসে বিচারকদের আটকে রেখে ভীতি প্রদর্শন তার প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এবং তাদের অধীনে কাজ করা কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি বিচার বিভাগের আধিকারিকদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে যাবে— এ প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। আগের দলদাস মুখ্যসচিব এবং ডিজিকে অপসারণের পরে নবাগতরাও দলদাসবৃত্তি অবলম্বন করে জেহাদি সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার ধারা অব্যাহত রাখছেন, যা সর্বোচ্চ আদালতে ভর্ৎসিত হয়েছে। এতে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'যাকে সরিয়ে যাকে আনবে সবাই আমার লোক'। অর্থাৎ পুরো রাজ্য প্রশাসন খাঁচার পাখিতে পর্যবসিত হয়েছে, তাদের ওড়ার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছে। এটাই মুখ্যমন্ত্রীর ১৫ বছর শাসনের উৎকর্ষ। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহারের দ্বারা একমাত্র সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। অবাধ নির্বাচনের দ্বারা জনমতের প্রকৃত প্রতিফলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অচলায়তন দূর করা সম্ভব বলে অনেকেই আশাবাদী। বিএলও/এইআরও/ইআরও-দের অকর্মণ্যতা-সহ রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের মিলিত চক্রান্তের কারণে যে বৈধ ভোটাররা এবারে তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না, তাঁদের জন্য রইল সমবেদনা। দুর্নীতিগ্রস্ত, চরিত্রহীন রাজনীতিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে নির্বাচন কমিশন বা জ্ঞানেশ কুমার, মনোজ আগরওয়ালদের দোষারোপ করে লাভ নেই। কেননা নির্বাচন কমিশনের হয়ে রাজ্যের অফিসাররা এসআইআর-এর কাজ করেছেন। ভোটারদের তথ্য আপলোড করার সময় এত গরমিলের বা গুলিয়ে দেওয়ার পিছনে কোনো চক্রান্ত বা অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তৃণমূলনেত্রী চেয়েছিলেন যাতে পুরো প্রক্রিয়াটি ভেস্তে যায়। এ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগের ভোটার তালিকা অনুযায়ী যাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন করানো হয়, সেই লক্ষ্যে রাজ্যের কোষাগারের কোটি কোটি টাকা অপব্যয় করে সুপ্রিম কোর্টের প্রতিটি শুনানিতে তিনি নামজাদা উকিলদের দাঁড় করিয়েছেন। তবে এতরকম চক্রান্ত করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলনেত্রীর নৈরাজ্যের শাসনের অবসান প্রয়োজন। তার জন্য ২৩ ও ২৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে অগ্নিপরীক্ষা। এই পরীক্ষায় রাজ্যবাসীকে সাফল্যমণ্ডিত হতেই হবে।

(লেখক ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য প্রবন্ধক)

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে এবং নিজেরা বাঁচতে হিন্দুদের একজোট হতেই হবে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয়।।
(কাশীরাম দাস—মহাভারত)

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সাল। সকাল ১০টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-য়ের নলিয়াখালি আর গলাডহরা গ্রামের হিন্দুদের ওপর নেমে আসে বর্বরোচিত আক্রমণ। ওই দুটি গ্রামের ২৮৮ পরিবার যারা কোনোরকম ভাবে কল্পনাই করেনি যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের পথের ভিখারি হয়ে যেতে হবে। তাদের সকলের ভয়ার্ত চোখে একটাই প্রশ্ন ছিল, পালিয়ে যাব কোথায়?

পরেরদিন দ্য টাইমস ইন্ডিয়ার খবরে লেখে— পুলিশের সামনেই সকাল ১০টায় হিন্দুদের বাড়িঘর পুড়তে থাকে। নারীর অপমান হতে থাকে। ২৮৮টি বাড়ি পুড়ে ভস্মীভূত হয়। ওই এলাকার লোকের মতে ১০-২০ হাজার লোক একত্রিত হয়ে এই আক্রমণ চালায়। দোতলাবাড়ি ভেঙে চুরমার, ধানের গোলা পুড়ে ছাই, কিন্তু মুসলমানদের বাড়িগুলো অক্ষত রয়েছে।

অথচ সেদিনের সেই ঘটনার মাত্র একমাস আগে ২২ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং শহরের স্পোর্টস্ কমপ্লেক্সের মাঠে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন— 'গুজরাট দাঙ্গা করতে পারে, আমরা পারি না।' মুখ্যমন্ত্রী যেখানে ভাষণ দিচ্ছিলেন, সেখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরের ঘটনা— ১৯ ফেব্রুয়ারি জেহাদি আক্রমণ সারা রাজ্যে পরিকল্পিতভাবে চলেছে হিন্দুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন, হত্যার ঘটনা। কেন্দ্র সরকার দেশের সুরক্ষার স্বার্থে যে কোনো আইন সংসদে পাশ করলে রাজ্য সরকারের উসকানিতে জেহাদিরা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস এবং হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে নেমে পড়ে। সবশেষে এসআইআরকে কেন্দ্র করে ১ এপ্রিল কালিয়াচকের মোথাবাড়িতে তিন মহিলা-সহ সাতজন বিচারপতিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটক করে রাখার মধ্য দিয়ে জেহাদিরা দেশের ব্যবস্থাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে।

সম্প্রতি এসআইআর-এ রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ৯১ লক্ষ লোকের নাম বাদ পড়েছে। সে কারণে মুখ্যমন্ত্রী হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন— 'বাংলা থেকে একজনকেও তাড়াতে দেব না। প্রয়োজনে নিজে ট্রাইবুনালে যাবেন বাদ পড়াদের নাম তুলতে।' তাঁর এই হুঙ্কারে অনেকেই মুচকি হেসে বলছেন— 'পশ্চিমবঙ্গ-সহ বারোটি রাজ্যে এসআইআর ঘোষণা হওয়ার অনেক আগে বিহারে যখন এসআইআর শুরু হয় তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর হলে রাজনৈতিক ভাবে তিনি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই তখন থেকে তিনি নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করে হুমকি দিয়ে চলেছেন। কিন্তু তাঁর হুমকি কোনো কাজে লাগেনি। যেমন, তিনি বলেছিলেন— (১) এরাজ্যে এসআইআর হতে দেবেন না। অথচ এসআইআর সঠিকভাবেই হয়েছে। (২) ভোটারলিস্ট থেকে একজনেরও নাম বাদ দিতে দেবেন না। কিন্তু ৯১ লক্ষ নাম ভোটার লিস্ট থেকে বাদ পড়েছে। (৩) বলেছেন, পুরনো ভোটার লিস্ট ধরে ভোট করতে হবে। কিন্তু তা না করে নতুন ভোটারলিস্টেই ভোট হবে। এবারের হুমকি— 'বাংলা থেকে একজনকেও তাড়াতে দেব না।' এখন দেখা যাক, আগামী দিনে কী হয়।

> **রাজনীতির মাঠে শাসকের বিরোধী দল থাকলেও প্রকৃত বিরোধিতা আসছে মানুষের মধ্যে থেকে। গ্রামে-শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্প পেলেও 'দালালের দৌরাত্ম্য', 'কাটমানি' এবং 'প্রশাসনিক স্বজনপোষণ'-এর অভিযোগ বহুদিন ধরেই জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।**

সারাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নির্বাচন কমিশনের ওপর। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে কমিশন কয়েকবছর পরপর বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন করে থাকে। সেইমতো এবার পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া আরও এগারোটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। অন্য রাজ্যসরকারগুলো তাতে সহযোগিতা করলেও ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গ। এই রাজ্যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এই প্রক্রিয়াতে প্রতি পদে বাধা সৃষ্টি করেছেন। তার ফলে কমিশন এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে যেন একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব মনে হয়েছে। যার শেষ পরিণতি হয়েছে কালিয়াচকের

মোথাবাড়িতে সাত বিচারপতিকে রাত বারোটা পর্যন্ত ঘেরাও করে রেখে অমানুষিক চাপ সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে। যে কাজে অংশগ্রহণ ছিল শুধুমাত্র রাজ্যের জেহাদি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের। অনেকেই বলে থাকেন, কেন্দ্র সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কিংবা নির্বাচন কমিশনের কাজের বিরোধিতা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারবার মুসলমানদের মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর প্ররোচনায় পা দিয়ে মুসলমানরা কোনোদিনই উপকৃত হননি বরং তারা আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

সম্প্রতি একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের প্রতি যে হুমকি দিয়েছেন, তা জনমানসে যথেষ্ট আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে— তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রী হিন্দুদের ১২টা বাজানোর আগাম অনুমতি দিয়ে রাখলেন মুসলমানদের দিয়ে? কিছুদিন আগে এসআইআর-এর বিরোধিতা করে ধর্মতলার ধরনামঞ্চ থেকে তিনি বলেছিলেন— 'আমরা আছি বলে আপনারা সবাই ভালো আছেন। যদি আমরা না থাকি, যদি তেমন দিন আসে তাহলে এক সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি জোট বেঁধে ঘিরে ফেললে এক সেকেন্ডে দেবে একদম ১২টা বাজিয়ে। যদি নিজের ১৩টা বাজাতে না চান তাহলে বিজেপির অপপ্রচারে কেউ কোনোদিন ভুল বুঝবেন না।' এভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সরাসরি হুমকি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে থাকা তৃণমূল নেত্রী।

বহুক্ষেত্রে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর আলটপকা মন্তব্যের কারণে রাজ্যে অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। যেমন--- রামনবমী, হনুমান জয়ন্তী, দুর্গাপূজার বিসর্জন প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানরা ইট-পাথর ছুড়ে আনন্দ উপভোগ করলেও পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। যে পশ্চিমবঙ্গে একসময় রামনবমীর শোভাযাত্রা এবং মহরমের মিছিল একে অপরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে কোনো সমস্যা হয়নি, সেই পশ্চিমবঙ্গে ২০১৬, ২০১৭ থেকে শুরু করে এখনও রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দুদের উৎসব ও শোভাযাত্রা আক্রান্ত হয়েছে বা হচ্ছে। যেমন— ধুলাগড়, দেগঙ্গা, বাদুড়িয়া, হাজিনগর, জলঙ্গি, মেদিনীপুর, তেলেনিপাড়া, খিদিরপুর, অঙ্কুরহাটি, রানিহাটি, উলুবেড়িয়া, শিবপুর এবং আরও অসংখ্য জায়গায়। কিন্তু সব জায়গাতেই পুলিশ সব দেখেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে কার অঙ্গুলি হেলনে, সে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক।

অনেকেই বলছেন, ১৫ বছরের শাসনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে জমে থাকা ক্ষোভ, অভিযোগ, স্থানীয় স্তরে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার প্রশ্নে বহু ভোটার এবার সরাসরি পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকছেন। তাই অনেকেই মনে করছেন, এবার দলীয় শক্তির লড়াই নয়, এই নির্বাচন হবে মানুষের ক্ষোভ ও শাসকদলের ব্যর্থতার নিরিখে। রাজনীতির মাঠে শাসকের বিরোধী দল থাকলেও প্রকৃত বিরোধিতা আসছে মানুষের মধ্যে থেকে। গ্রামে-শহরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্প পেলেও 'দালালের দৌরাত্ম্য', 'কাটমানি' এবং 'প্রশাসনিক স্বজনপোষণ'-এর অভিযোগ বহুদিন ধরেই জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। উপরন্তু সাধারণ মানুষ আরও দেখছে যে, সরকারের অনড় মনোভাবের জন্য এবং নেতা-মন্ত্রীদের সরাসরি আখের গোছানো দেখেশুনে তারা ক্ষিপ্ত। প্রতিটি ক্ষেত্রে চুরি এই সরকারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৬ হাজার ছেলে-মেয়ের চাকরি বাতিল, চাকরির পরীক্ষায় পাশ করেও বছরের পর বছর রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত, মাথায় করে যোগ্য ছেলে-মেয়েরা রাস্তায় বসে রয়েছে। কয়লা, বালি, রেশন সামগ্রী, স্কুলের ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের মুখের খাবার চুরি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্তদের জন্য কেন্দ্র থেকে পাঠানো খাদ্য, অর্থ, ত্রিপল চুরি সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষ আজ অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত। শুধু কি তাই? এবার দেখে নেওয়া যাক তৃণমূলের ১৫ বছরের অপশাসন এবং রক্তাক্ত পশ্চিমবঙ্গের অভিশপ্ত অধ্যায়। যেমন— বঞ্চিত ২০ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মী। ৪০ লক্ষেরও বেশি পরিযায়ী যুবক-যুবতী। 'চা সুন্দরী আবাসন প্রকল্পে'র মতো প্রতারণার ফাঁদে চা-শ্রমিকরা, বন্ধ তরাই-ডুয়ার্সের ৮০ শতাংশ চা-বাগান। ধান উৎপাদনে শীর্ষস্থান হারিয়ে নেমে এসেছে তৃতীয় স্থানে। পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হয়েছে ৬,৬৮৮টি শিল্প সংস্থা। দেশের মোট অ্যাসিড হামলার মধ্যে ২৭.৫ শতাংশ ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। ৩০ লক্ষ কর্মসংস্থান নষ্ট করা হয়েছে। দুর্নীতির জেরে ২৬,০০০ চাকরি বাতিল। রাজ্যে প্রায় ৮,০০০টি স্কুল বন্ধ। ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা ৫৬৯ কিলোমিটার, তারমধ্যে জমিজটে এখনও পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশের সীমান্ত প্রায় ২৬০ কিমি. উন্মুক্ত। এ রাজ্য থেকেই অবাধে অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়া হয়। রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য বাজেট নিম্নগামী। ৫ লক্ষ শ্রমিকের পরিবার ধুঁকছে। সরকারি পাঠ্য পুস্তকে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে সন্ত্রাসবাদী বলে অঙ্কন করা হয়েছে। দেশের প্রথম মহিলা জনজাতি রাষ্ট্রপতিকেও কদর্য ভাষায় আক্রমণ। উড়ালপুল বিপর্যয়। অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুপুরী মহানগরী। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল নেতাকে ব্যালট পেপার চিবিয়ে গিলে খেতে দেখা গিয়েছে। অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক এদের খিদের বহর ও হজমশক্তি। এরা যা পায় তাই খায়, কোনো বাছবিচার করে না।

স্বভাবতই আজকের দিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 'তোমার সৃষ্টির পথ' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

''তোমার সৃষ্টির পথে রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।'

দুয়ারে বিধানসভা নির্বাচন, কোন কৌশলে গদি আঁকড়ে থাকার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল ?

বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোয় যেখানে মাথা নীচু করে চলার কথা তৃণমূলের বিভিন্ন চোরদের, তারাই বুক ফুলিয়ে ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়েছেন দু'কান কাটার মতো।

প্রণবজ্যোতি ভট্টাচার্য

আসন্ন নির্বাচন। তাই পোয়াবারো রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের। ভোট-বাজারে টাকা ওড়ে। সেই টাকার একটা বড়ো অংশই যায় শাসক দলের নীচুতলার কর্মীদের পকেটে। বাকিটা যায় দলের ওপর স্তরের নেতাদের পকেটে। যে কোনও রাজনৈতিক দলের সম্পদ এই নীচুতলার কর্মীরাই। এরা হচ্ছে, হাওয়া-মোরগের দল। ভোটের হাওয়া যেদিকে বইবে, এরাও সেই দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নেবে। তাই শাসক দলের কাছে এদেরই কদর। এই 'বোড়ে'দের ধরে রাখতে শাসক দল কখনও পূজার নামে অনুদান বাবদ লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত দেয়। কখনও আবার কেবল মুরগির মাংসের ঝোল-ভাতেই আদায় করে নেয় কাজ। ছাপ্পা মারা, বিরোধী দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের চমকে-ধমকে রাখার কাজটাই মূলত এরা করে। এদেরই একটা অংশ ছাপ্পা মারতে ওস্তাদ। আসলে এরা হলো সেই উচ্ছিষ্টভোজীর দল, যারা ভোট করে প্রার্থীদের হয়ে। আর প্রার্থী? তিনি কোনও না কোনওভাবে কিছু বাগিয়ে নিয়ে বাড়ি-গাড়ি হাঁকান। তার পর নির্বাচনে দল হেরে গেলেই, এরাও জার্সি বদলায়। তাই শাসক আসে, শাসক যায়, পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিশেষ বদলায় না।

রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলির পঠনপাঠনের মান অতি নিম্নমানের। তাই সেখানে পড়ুয়া ধরে আনতে হয় মিড-ডে মিলের টোপ দিয়ে। সরকার পোষিত স্কুলগুলির এমন দশার সুযোগে রাজ্যের সর্বত্র গজিয়ে উঠছে বেসরকারি বিভিন্ন স্কুল, নানা অছিলায় যারা আক্ষরিক অর্থেই পকেট কাটছে সাধারণ বাঙ্গালির। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার হালও করুণ। সেখানে গেলে দেখা যাবে, অধিকাংশ অভিজ্ঞ চিকিৎসক সরকারি পরিষেবা দেওয়ার চেয়ে অগ্রাধিকার দেন কোনও ওষুধের দোকানের চৌখুপি একটা ঘরে। এই ঘরের গালভরা একটা নামও আছে। সেটা হলো চেম্বার। সরকারি হাসপাতালগুলির বেহাল দশার ছবি দেখে এই চেম্বারেরই হাঁড়িকাঠে মাথা গলাতে বাধ্য হন রোগী এবং তাঁদের পরিবার। রোগী যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানুষটি জমি-জিরেত-ভিটে খুইয়ে আক্ষরিক অর্থেই পথে বসেন। তারপর তিনিও একদিন হাতে তুলে নেন শাসক দলের ঝান্ডা। যদি কিছু করেকম্মে খাওয়া যায় আর কী! বস্তুত, এই সর্বহারাদেরই কাজে লাগিয়ে বছরের পর বছর গদি আঁকড়ে পড়ে ছিল সিপিএম-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট।

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের ভোটরঙ্গে বিসর্জন হয় বামেদের। ক্ষমতায় আসে তৃণমূল। তারা এসেই হাত পাকিয়েছে চুরিতে তাদের গায়েও জমেছে 'কেলেঙ্কারির শ্যাওলা'। তার জেরে ফাঁস হয়েছে একের পর এক কুকীর্তির খবর। তৃণমূলের একনেতার বিরুদ্ধে উঠেছে গোরু পাচারের অভিযোগ; দিদি-উত্তর কালে যিনি নবান্নের চোদ্দতলার ঠাণ্ডা ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসবেন বলে ইতিমধ্যেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন, তাঁর গায়েও লেগেছে কয়লা পাচারের কলঙ্ক। আবার চাকরি দেওয়ার নাম করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গিলে জেল খেটেছেন শাসকদলের নেতা তথা তৎকালীন এক শিক্ষামন্ত্রী। অবশ্য টাকা উদ্ধার হয়নি তাঁর বাড়ি থেকে, উদ্ধার হয়েছে তাঁর বান্ধবীর ঘর থেকে। বোধহয়, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এই বান্ধবীই হয়ে উঠেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর লকারের হকদার। বান্ধবীর আঁচলেই বোধহয় বাঁধা ছিল 'দামোদর শেঠ' বাড়ির চাবির গোছা! বিরোধীদের একটা বড়ো অংশের অভিযোগ, বান্ধবীর ঘরে যে টাকার-পাহাড়ের খোঁজ মিলেছে, সেই টাকা এসেছে শিক্ষকদের চাকরি চুরি করে অযোগ্যদের কাছে বিক্রি করে। বস্তুত, তৃণমূল শাসনের বয়স যত গড়িয়েছে, ততই লম্বা হয়েছে দুর্নীতির তালিকা। তা সত্ত্বেও, পর পর তিনটে মেয়াদে জয়ী হয়ে রাজ্য শাসন করেছে তৃণমূল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, (ভোট চুরি-ছাপ্পা দেওয়া ছাড়াও) এর নেপথ্যে রয়েছে দুধেল গাইদের বাড়বাড়ন্ত। প্রথমে কংগ্রেস এবং পরে বামেদের মতোই তৃণমূলও করে গিয়েছে তোষণের রাজনীতি। সেই রাজনীতির পারা যত চড়েছে, ততই 'ডোন্ট কেয়ার-ভাব' এসেছে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দুধেল গাইদের একটা বিরাট অংশের মধ্যে। নানা অছিলায় তৃণমূলের এই দুধেল গাইদের সন্তুষ্ট করে রাখতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই কারণেই তিনি হিন্দুকন্যা হওয়া সত্ত্বেও রেড রোডে মুসলমানদের ভিড়ে মিশে গিয়ে তিনি আদায় করেছেন নমাজ। অবশ্য

এজন্য যে তিনি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ধর্মের অবমাননা করেছেন, তা কিন্তু নয়। নবান্নের গদি বাঁচাতে পুরীর দয়িতাপতিকে নিয়ে এসে বাড়িতে যজ্ঞও করেছেন তৃণমূলের সর্বময় কর্ত্রী। সেই তিনিই আবার ভেক ধরে ভিড়ে গিয়েছেন ২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টানদের অনুষ্ঠানে। এসবেরই অর্থ হলো, নবান্নকে পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত করা, যেখানে পিসির পরে বসবেন ভাইপো, তার পর কালীঘাটের হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অন্য কেউ। নবান্নকে বাপের সম্পত্তি ভেবে নিয়ে তৃণমূল নেত্রী দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন তুষ্টীকরণের রাজনীতি। যার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসীকে।

এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হলো কালিয়াচকে টানা ১৮ ঘণ্টা ধরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে রাখা, রামনবমীর শোভাযাত্রায় ইট-পাটকেল ছোড়া। সূত্রের খবর, এসবেরই নেপথ্যে রয়েছে জেহাদিদের আস্ফালন। যে আস্ফালন রুখতে আসন্ন নির্বাচনে একাধিক কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

কেবল কলকাতা নয়, জেহাদিদের দাপট বেড়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়ও। রাজ্যে ইসলামি শাসনের ভিত মজবুত করতে এই জেহাদিরাই কখনও ভাঙছে হিন্দুদের ঘর-বাড়ি। কখনও আবার তাদের টার্গেট বিরোধীদের পার্টি অফিস। ভোটারদের ভীত-সন্ত্রস্ত করতেও আসরে নেমে পড়েছে রাজ্যের শাসক দলের এই 'সম্পদ'রা (পড়ুন, আপদরা)। কখনও মাথায় ফেট্টি বেঁধে, বাইকের সামনে-পেছনে তৃণমূলের ঝান্ডা লাগিয়ে সাঁই সাঁই করে এলাকা চষে বেড়াচ্ছে এই জেহাদিরাই। এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করতেই লাল চুল, কানে দুল পরা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতরা বাইক নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এহ বাহ্য। তৃণমূলের জমানায় নেত্রীর আশীর্বাদী হাত মাথায় থাকায় আদতেই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এই অর্বাচীনের দল। যার বিষময় ফল দেখা গিয়েছে দিন কয়েক আগেই।

সেদিন ভবানীপুর কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিতে গিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা নন্দীগ্রামের 'জায়ান্ট কিলার' বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুভেন্দুবাবুর মনোনয়নপত্র পেশের সময়ও তাঁদের ঘিরে রেখেছিল এই দুধেল গাইদের দল। তৃণমূলের ভৈরববাহিনীর এই তাণ্ডব তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে দেখা গিয়েছে নিধিরাম সর্দার পুলিশকর্মীদের। হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও, তা ব্যবহার করার অনুমতি না থাকায় কার্যত স্ট্যাচু হয়ে গিয়েছিলেন শুভেন্দু এবং শা'র সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ভোট ঘোষণার পর থেকে রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের অকর্মন্যতা ও নির্লজ্জ দলদাসবৃত্তি চোখ টেনেছে রাজ্যবাসীর। তাই গণ্ডগোল হলেও, হাতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র থাকলেও, তৃণমূল নেতাদের অঙ্গুলিহেলনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনে বিরত থাকছেন রাজ্য পুলিশের ধামাধরা শীর্ষ কর্তারা। তৃণমূল নেত্রীর রোষানল থেকে বাঁচতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার দুঃসাহস দেখায়নি এই স্তাবকের দল। রাজ্যের একাধিক জায়গায় এমনতর ঘটনা ঘটতে থাকলেও 'নিধিরাম সর্দার' হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর তাগড়াই চেহারার জওয়ানরা। এতে আরও অক্সিজেন পেয়ে গিয়েছে তৃণমূলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা। তাই এ রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা থেকে শুরু করে সাংবিধানিক কাঠামো যে পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে, সেটা কালিয়াচককাণ্ডে তাদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানিয়ে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শুধু তাই-ই নয়, দেশের শীর্ষ আদালতে ভর্ৎসিত হতে হয়েছে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে। কালিয়াচককাণ্ডের তদন্তে রাজ্য পুলিশের ওপর আস্থা হারিয়ে এনআইএ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই ঘটনার তদন্তভার। এহেন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচনেই রাজ্যের শাসক এবং বিরোধী দলের প্রচারের হাতিয়ার আলাদা আলাদা। কয়লাচোর, গোরুচোর কিংবা বালিচোর, রেশন সামগ্রী চুরি করে খেয়ে পেট মোটা করা ভদ্রলোক হোক অথবা চাকরি চোরের দলের মুখে উন্নয়নের কোনও কথা নেই। বিভিন্ন কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানোয় যেখানে মাথা নীচু করে চলার কথা তৃণমূলের বিভিন্ন চোরদের, তারাই বুক ফুলিয়ে ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়েছেন দু'কান কাটার মতো। কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প বাবদ যে টাকা আসে, তার একটা বড়ো অংশই চলে যায় 'ভোট কিনতে'! একের পর এক 'শ্রী' চালু করে তার আওতায় রাজ্যবাসীকে নিয়ে এসে বস্তুত ভিখিরি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ঘাসফুলের দল। কিছু মানুষও আহ্লাদে আটখানা! কারণ কোনও পরিশ্রম ছাড়াই ফোকটে আসছে কখনও দেড়হাজার, কখনও তার চেয়ে খানিক বেশি। এই খয়রাতির রাজনীতি করতে গিয়ে তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার আদতে ভেঙে দিয়েছে বাঙ্গালির কোমর। চাকরি নেই, শিল্পও নেই, কাজ নেই , এই নেইরাজ্যে তাই মস্তিতে নেই রাজ্যের শিক্ষিত তরুণরা। এরা প্রায় প্রত্যেকেই কাজের খোঁজে গিয়ে থিতু হয়ে গিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। দীর্ঘদিন এদের সামনে চাকরির গাজর ঝুলিয়ে ভোট কিনেছে রাজ্যের শাসক দল। ঘাসফুল শিবিরের এই চালাকিটা ধরে ফেলেছে চাকরিপ্রার্থীদের একটা বড়ো অংশ। তারাও দেখছে, হনহনিয়ে ভোট ভিক্ষে করতে করতে চলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরঘুর করছেন উচ্ছিষ্টভোজী, তোষামোদকারী, স্তাবকের দল। তৃণমূল জমানায় আখের গুছিয়ে নিতে চাওয়া এই শ্রেণীর লোকজন তাই প্রশ্ন করতে পারছেন না, রাজা তোর কাপড় কোথায়?

বস্তুত, নানা ক্ষেত্রে চুরি করে রাজ্যের শাসক দলের লোকজন পশ্চিমবঙ্গকে বানিয়ে ছেড়েছেন চৈত্র মাসের সজনে ডাঁটা, যাতে পেট ভর্তি বীজ থাকলেও, রস-কষহীন।

শাসক দল যখন কেলেঙ্কারির কালি গায়ে মেখেও ভোট চাইতে বেরিয়ে পড়েছে, তখন হাত গুটিয়ে বসে নেই বিরোধী দল বিজেপি। তারা হাতিয়ার করছে তৃণমূলের নানা বয়সি নেতার বিভিন্ন রকমের দুর্নীতিকেই। ভোট ময়দানে বেরিয়ে সেকথাই মানুষকে বলছেন তাঁরা। তাঁরা ক্ষমতায় না থাকলেও, রাজ্যবাসীকে আশ্বাস দিচ্ছেন সুশাসনের। যে সুশাসনের জেরে নরেন্দ্র মোদী পরিচালিত ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিয়েছে। এতদিন যে ভারত বিশ্বমঞ্চে গিয়ে এক কোণে বসে থাকত, সেই ভারতই এখন বিশ্বমঞ্চে করছে সিংহগর্জন, যাকে সমীহ করে চলছে আমেরিকা-ফ্রান্সের মতো দেশও। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে ভোটাররা কাকে বেছে নেবেন , ঠগিদের দলকে নাকি আদ্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহকের দলকে, এখন তা-ই দেখার।

পনেরো লাখের তত্ত্ব
প্রতিশ্রুতি না বাস্তবতা?

অর্ণব কুমার দে

সময়কালটি এই শতাব্দীর প্রথম দশক শেষ করে দ্বিতীয় দশকে পা রেখেছে ভারত। ভারত জুড়ে সরকারি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চরম দুর্নীতি ও অপশাসনের ঢেউ আছড়ে পরেছে সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায়। অন্যদিকে ভারতের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি কোমর কষেছে এই সরকারকে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পরাস্ত করবে বলে। গুজরাতের ১২ বছরের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী এবারে ভারতের হাল ধরবেন বলে প্রচার চালাচ্ছেন। তৎকালীন ভোট প্রচারে মোদী বললেন, 'ভারতে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে তার সব টাকা উদ্ধার হলে প্রত্যেক নাগরিককে ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া যেতে পারে।' এরপর ২০১৯ সালে ও ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচন এলে কিছু বিরোধী নেতা এই প্রচারে নেমে পড়েন যে, নরেন্দ্র মোদী ১৫ লক্ষ টাকা দেবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে টাকা কোথায়? সত্যিকথাতো, শ্রীমোদী যদি বলে থাকেন, তাহলে দেওয়া উচিত। মোদীজীর নিজেই বলেন 'মোদী হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়'। কিন্তু ভারতের কোনো নাগরিক একথা বলতে পারবেন না যে, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পনেরো লক্ষ টাকা জমা হয়েছে। তাহলে কি মোদীজীর সেই ভাষণ ছিল ভোটের প্রতিশ্রুতি? বামপন্থীদের মুখে এই অভিযোগ শোনা যেত, বর্তমানে ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভারতীয় জনতা পার্টির সংকল্পপত্র প্রকাশ পেতেই, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সেই অভিযোগ করে বসেন— পনেরো লক্ষ টাকা কোথায় গেল?

সাধারণ মানুষ তাদের পকেট না হাতড়ে বরং বুদ্ধি খাটালেই দেখতে পাবেন সত্যি টাকা এসেছে না পুরোটাই ফাঁকা আওয়াজ। তাহলে দেখা যাক আসল সত্যটি কী? ২০১০ সালে ভারত আন্তর্জাতিক স্তরে বিশ্বের নবম অর্থনীতি বলে বিবেচিত হতো, যা ২০২৫ সালে ভারত বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতিতে এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে ২০১০ সালে ১,৬৮,০০০ কোটি টাকার অর্থনীতি ছিল ২০২৫ সালে তা কিনা ৪, ১৩,০০০ কোটির অর্থনীতির মাত্রা ছুঁয়েছে। তাহলে প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা এই সময়কালে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ১৫ বছরের মধ্যে ২০২০ ও ২০২১ এই দুটি বছরে বিশ্ব মহামারিতে আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষতিসাধনে বিশ্বের অর্থনৈতিক অগ্রগণ্য দেশের সঙ্গে ভারতকেও বেশ আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। বহু দেশ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। ভারত সেখানে এক অভূতপূর্ব ব্যবস্থা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এই মহামারির সময় থেকে প্রায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে সেই সময়েও পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী রেশনের চাল-গম চুরি করে এক অনবদ্য নিদর্শন রেখেছেন। পশ্চিমের দেশগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ মেনে নিয়ে নোট ছাপিয়ে তাদের দেশবাসীকে বণ্টন করেছেন। তার ফলস্বরূপ ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান-সহ বহু দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ভারতের অর্থ মন্ত্রকের উপদেষ্টা সঞ্জীব

পশ্চিমের দেশগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ মেনে নিয়ে নোট ছাপিয়ে তাদের দেশবাসীকে বণ্টন করেছেন। তার ফলস্বরূপ ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান-সহ বহু দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ভারতের অর্থ মন্ত্রকের উপদেষ্টা সঞ্জীব সান্যালের মতো পরামর্শদাতাদের হাত ধরে ভারত সে সংকট সহজেই উতরে যেতে পেরেছে।

সান্যালের মতো পরামর্শদাতাদের হাত ধরে ভারত সে সংকট সহজেই উতরে যেতে পেরেছে। এহেন কারণে ভারতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অব্যাহত থেকেছে আর সেই কারণেই ইউরোপ ও ব্রিটেন ভারতের সঙ্গে আটকে থাকা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে বেশ উৎসাহে এগিয়ে এসেছে। যদিও মার্কিনি অস্থিরতাও এই Free Trade Agreement (FTA) করবার একটি প্রধান উপাদানও হয়েছে। এছাড়াও ২০১০ সালে ২১,০০০ থেকে ২৫,০০০-এর গণ্ডিতে ঘুর্ণিপাক খাওয়া শেয়ার বাজার ৮০,০০০-এর মাত্রা পেরিয়ে যেতে পেরেছে।

এই সময়কালে ভারতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, কৃষক সম্মান নিধি ইত্যাদি জনস্বার্থ প্রকল্পের সঙ্গে সঙ্গে জল জীবন মিশন-সহ বহু প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত ১১ বছরে প্রায় ৩.৫ হাজার কিলোমিটার নতুন রেলপথ স্থাপিত হয়। ভারতের পাঁচটি শহরে ২০১৪ সালে ২৪৮ কিলোমিটার মেট্রো রেল পরিচালিত হতো, ২০২৫ সালে ২৬টি শহরে ১০৯০ কিলোমিটার মেট্রো রেল পরিচালিত হচ্ছে। কলকাতাতে ২০২৫ সালে ইস্টওয়েস্ট মেট্রো রেলটি হাওড়া আগত যাত্রীদের কাছে আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেই সকলেই মনে করছেন। এছাড়া হাইওয়ে, হাসপাতাল, সীমান্তবর্তী সড়ক, উচ্চতম ব্রিজের সঙ্গে জাহাজ ও সামরিক সরঞ্জাম ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বাড়িয়ে চলেছে। যদি রাফাল যুদ্ধবিমানটির বিষয়ে আলোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যায় একটি বিমানের দাম ১,৬০০ কোটি টাকা। সেই মতো ১১৪টি বিমান ভারত নিজের সুরক্ষার স্বার্থে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করে তার চুক্তি স্বাক্ষরিত করে ফেলেছে। ইসরোতেও অর্থ বিনিয়োগ করতে কার্পণ্য দেখায়নি বর্তমান ভারত সরকার। তাহলে এই সব অর্থমূল্যকে একত্র করলে মানুষকে ভেবে দেখতে হবে কত টাকা প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নাগরিকদের দিয়েছেন।

অর্থ এলেই হলো না, তাকে সংরক্ষণ করতে হয়। ভারতে জালনোটের কারবার এত পরিমাণে ছিল, যার ফলে ভারতে একটি সমান্তরাল অর্থনীতির সৃষ্টি করেছিল শত্রু দেশগুলি। টাকার দর ভারতে যেমন অবমূল্যায়নের দিকে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে এই জালনোট ব্যবহার করে জঙ্গি সংগঠনগুলি বিভিন্ন স্থানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সাম্প্রতিককালে দেশকে মাওবাদী জঙ্গি মুক্ত করার পিছনে সৈন্যবল যেমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তেমনি মাওবাদীদের হাতে অর্থের ঘাটতি তৈরি করতে ভারত সরকার সমান তালে প্রয়াস করেছে। বিদেশি অর্থ হাতে না আসায় মাওবাদীরা তাদের অস্ত্রের সম্ভার জোগাড় করতে বেশ বেগ পেয়েছে। এই মাওবাদী ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ২০১৪ সাল থেকে ক্রমাগত লড়াই চালিয়েছে ভারত সরকার। নোট বাতিল করে জালনোটের কারবার নষ্ট করার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের ভারত ভাগ করবার দুষ্ট পরিকল্পনা। টাকা ও অস্ত্রের জোগান অব্যাহত থাকলে এই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে কত প্রাণ বিনাশ হতো? তাহলে একজন নাগরিকের প্রাণের দাম কত? সেটা কি পনেরো লক্ষ? যে মুখ্যমন্ত্রী ধর্ষিতাদের জন্য দর নির্ধারণ করতে পারেন, তিনি অবশ্য প্রাণের দামও নির্ণয় করতে পারেন। এছাড়াও সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো বা ইউপিআই আসায় ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কালোবাজারি অনেকাংশে বন্ধ করে সাধারণের জীবনে সেই টাকার সদ্ব্যবহার করেছে এই সরকার।

এর পর মানুষ মূল্যায়ন করে দেখতে পারেন নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কতটাকা ভারতবাসী পেয়েছেন। এবার সরলভাবে বোঝা যাক। আপনাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ধরুন পনেরো টাকা দেওয়া হবে। তার ৬ টাকা দেওয়া হলো। তার অর্ধেক জালনোট, তাহলে আপনি পেলেন ৩ টাকা। কিন্তু এখন ভারত সরকার আপনাকে ৬ টাকাই দিয়েছে। আরও তিনটাকা আপনার জীবন বাঁচাবার জন্য অথবা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য খরচ হয়েছে। আর যাতায়াত সুনিশ্চিত করার জন্য রেল বা সড়কে দুই টাকা খরচ করা হয়েছে। আরও দুই টাকা আপনার গরিব ভাইদের বাড়ি বানানোর জন্য দিয়েছে। এভাবে হিসাব ধরলে ৯-১০ টাকা ভারতবাসী পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। ভারতে বেশ কিছু রাজ্যে আঞ্চলিক স্তরে যে দুর্নীতিগুলি রয়েছে, যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম স্থান অধিকার করে আছে, তাকে মোকাবিলা করতে পারলে আগামীদিনে আরও ২-৩ টাকা পেয়ে যাওয়ার আশা রাখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের দান খয়রাতি, ভাতা দেওয়ার সরকার এই টাকা হাতে পেয়ে অর্ধেকের বেশি আত্মসাৎ করেছে, তাই মানুষ ভাবছেন টাকা তো এল না। আর যারা কৌটো নাচিয়ে ২০০৫ সালে ৪০০ কোটি টাকার সংসার বানিয়েছিল তাদের জীবনে তো খুঁত খোজাই একমাত্র লক্ষ্য। বাকি টাকা যদি সত্যি মানুষ পেতে চান তাহলে বাকি দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ও আত্মহননকারী রাজনীতির মতবাদকে, যত শীঘ্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডল থেকে দূরে রাখতে পারবেন— তত বাকি টাকা ও অর্থ দেশকে বৈভবশালী করার পথ প্রশস্ত করতে পারবে। ▫

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

‘বন্দে মাতরম্’-এ আপত্তি কেন?

দেশপ্রেম শুধু কথায় নয়, চেতনায়— এই বার্তাকে সামনে রেখে ‘বন্দে মাতরম’ উচ্চারণের প্রশ্নে সারাদেশে সমীক্ষা করার দাবি জোরদার হচ্ছে রাষ্ট্রবাদী মহলে। তাঁদের মতে, যে স্লোগান ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়ে বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছে, সেই ‘বন্দে মাতরম্’ বলতে যদি কারও আপত্তি থাকে, তবে তা জাতীয় চেতনার জন্য উদ্বেগের বিষয়।

রাষ্ট্রবাদী চিন্তাবিদ জগন্নাথ মণ্ডলের ভাবনাকে সামনে রেখে এই দাবিকে অনেকেই জাতীয় আত্মসম্মানের প্রশ্ন বলে মনে করছেন। তাঁদের বক্তব্য, মাতৃভূমির বন্দনা করা নিয়ে দ্বিধা থাকলে সেই মানসিকতার মূল্যায়ন করা সরকারের দায়িত্ব। হিন্দুত্ববাদী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্ব সন্ত শিকদার তীব্র সুরে বলেন, ‘‘দেশের মাটি, দেশের সংস্কৃতি এবং স্বাধীনতার ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। ‘বন্দে মাতরম্’ শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়— এটি জাতির আত্মার ধ্বনি।’’

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অন্যতম নেতৃত্ব অরুণাভ পোদ্দার বলেন, ‘দেশের স্বার্থে আজ সময় এসেছে স্পষ্টভাবে জানার--- কারা দেশের ঐতিহ্য ও আত্মপরিচয়ের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন, আর কারা করেন না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষের মনোভাব জানার জন্য একটি সর্বভারতীয় সমীক্ষা এখন সময়ের দাবি।’ রাষ্ট্রবাদী মহলের দাবি, স্বাধীনতার এত বছর পরেও যদি জাতীয় প্রতীক ও স্লোগান নিয়ে দ্বিধা থাকে, তবে তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। তাঁদের মতে, দেশের ঐক্য ও সংহতি অটুট রাখতে জাতীয় চেতনার প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া জরুরি।

এই দাবি ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোচনা শুরু হয়েছে। একাংশ মনে করছে, জাতীয় প্রতীকের প্রতি শ্রদ্ধা দেশের শক্তিকে একসূত্রে বাঁধে, অন্যদিকে ভিন্নমতও সামনে আসছে। তবে রাষ্ট্রবাদী মতাদর্শের সমর্থকদের বক্তব্য স্পষ্ট— দেশের মর্যাদা সর্বাগ্রে এবং সেই মর্যাদা রক্ষায় জাতীয় চেতনার প্রশ্নে আপোশ নয়। তাঁদের মতে, দেশের স্বার্থে এই সমীক্ষা শুধু একটি পরিসংখ্যান নয়, বরং জাতীয় আত্মপরিচয় ও ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

—কুন্তল চক্রবর্তী,
কলেজ রোড, বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

আত্মঘাতী হিন্দু বাঙ্গালি জাতি আর কবে নিজের ভালো বুঝবে?

পরাধীন ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পথে আর হিন্দু বাঙ্গালির স্থান হয়েছে ইসলামি দেশে। এক দূরদর্শী বাঙ্গালির প্রচেষ্টায় এবং হার না মানা লড়াইয়ের ফলে হিন্দু বাঙ্গালি পেল নিজস্ব হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের মধ্যে থাকার সুযোগ পেল, নিজের ধর্মীয় আচার আচরণের স্বাধীনতা পেল। তারপর চোখের সামনে একের পর এক জেহাদি আক্রমণে হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ হিন্দু বাঙ্গালির জীবন যেতে দেখলো এবং আজও দেখছে। ভিটেমাটি ছাড়া হলো কয়েক কোটি হিন্দু বাঙ্গালি, তথাপি আজও এদের চেতনার বিকাশ হলো না। তাহলে এদের আত্মঘাতী জাতি ছাড়া আর কি বলা যাবে?

অথচ একজন বাঙ্গালির হাত ধরে সৃষ্টি হলো একটি সংগঠন ‘ভারতীয় জনসঙ্ঘ’। পরবর্তীকালে সেই সংগঠনের পরিবর্তিত রূপ হলো ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। বাঙ্গালির আদর্শ ও চিন্তাভাবনা নিয়ে গঠিত রাজনৈতিক দলের উপর বিশ্বাস রাখলো সারা ভারতের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে ২১টি রাজ্য কিন্তু আজও বিশ্বাস রাখতে পারলো না শুধু হিন্দু বাঙ্গালি জাতি। হ্যাঁ, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের দূরদর্শিতার ফসল তুলে ভারত আজ পৃথিবীর ঈর্ষার দেশ হয়েছে। পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হয়েছে আর বাঙ্গালির কাছে সেই বিজেপি আজও অচ্ছুত, আজও বৃহত্তর একদল বাঙ্গালির কাছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক, ড. শ্যামাপ্রসাদ নাকি বঙ্গভাগের নায়ক। হায়রে বাঙ্গালি! আর কবে তাদের বোধ বুদ্ধি হবে?

বাঙ্গালি আর কবে ভাববে বাঙ্গালির আদর্শ নিয়ে গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্র কিংবা উত্তরপ্রদেশ অথবা ওড়িশা তরতর করে এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের পথে। আর বাঙ্গালি সেই শ্যামাপ্রসাদের মতাদর্শকে দূরে সরিয়ে রেখে আবার একবার দেশ ছাড়া হতে চলেছে? শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, কৃষিতে পিছতে পিছতে শেষ লাইনে, এটাই কি দেশের ‘মধু আর বিদেশের মধুসূদন’-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ নয়? ২০, ৩৪, ১৫টি করে বছর তো অন্যদের দিয়ে দেখা হলো, তাহলে ৫টি বছর ঘরের ছেলের আদর্শ নিয়ে পৃথিবী কাঁপানো দলের উপর ভরসা করলে কি খুব ক্ষতি হবে?

যোগেন মণ্ডলের একটা ভুল চিরকালের মতো একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে, সে ভুলের চোরাবালিতে তিনি নিজেই ডুবে মরেছেন অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে। হিন্দু বাঙ্গালিকে একবার অন্তত ভাবতে হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা, নিজের শেষ জীবনের কথা। আর ভুল নয়, এবার নয়তো আর নয়, চাই পরিবর্তন— ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে ২১ সঙ্গে ১ যোগ করে ২২-এর শক্তি অর্জন করা। Do it now, চলো গোপাল মুখার্জি হয়ে রক্ষা করি বাঙ্গালি হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ। বদলানো দরকার, চাই রাষ্ট্রবাদী সরকার।

—সিদ্ধানন্দ পুরকাইত,
ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

সুস্থ থাকতে সচেতন হোন মায়েরা

মৌ চৌধুরী

বর্তমানে অনেক অসুখই যেন অজান্তেই পৌঁছে যাচ্ছে অপারেশন টেবিল পর্যন্ত। ক্ষেত্রবিশেষে মহিলারাই যেন এগিয়ে আছেন অসুস্থতার দিক দিয়ে। দেখা যাচ্ছে ত্রিশের অনেক আগেই পিত্তনালী বাদ, হাঁটু কোমরে ব্যথা, অনিয়মিত ঋতুচক্র, কোষ্ঠকাঠিন্য, থাইরয়েড, অ্যাসিডিটি, আবার হয়তো-বা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি। সঙ্গে খিদে না হওয়া, খিটখিটে মেজাজ, ক্লান্তিভাব। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রায় ঘরে ঘরেই মহিলাদের একটা না একটা অসুস্থতার উপসর্গ লেগেই আছে।

প্রশ্ন আসতেই পারে, পুরুষেরাও অনেকেই ব্যথা বেদনা, প্রেসার, অম্বল-সহ অনেক অসুখেই ভোগেন, তবে শুধু মহিলাদের কথা কেন এত বেশি বলা হচ্ছে। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালের অভিজ্ঞ গাইনোকোলজিস্ট মন্দিরা চক্রবর্তী জানান, শতকরা সংখ্যার হিসেবে সাধারণত পুরুষদের শরীরের গঠনের জন্য এবং অল্প বয়স থেকে পরিশ্রমের ফলে তারা তুলনামূলক ভাবে কিছুটা সুস্থ থাকেন। অপরদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলা যারা গৃহস্থালীর পরিশ্রম ছাড়া আর কোনো কায়িক শ্রম তেমন ভাবে করেন না, তাদের ভেতর অসুস্থতার হার বেশি। তিনি বলেন, গৃহস্থালীর কাজে প্রচুর পরিশ্রম। কিন্তু এই পরিশ্রম খুব একঘেয়ে, ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর। এই ধরনের মহিলাদের সংখ্যাই সমাজে বেশি। এতে মনের উপর চাপ পড়ে। আবার যারা অফিসে একই জায়গায় বসে চাকরি করেন তাদের ওপরেও এক ধরনের মানসিক চাপ এসে যায়। এই দুই ধরনের মহিলাই অসুস্থ হন বেশি। তুলনায় যেসব মহিলা বাইরে কায়িক পরিশ্রম করেন যেমন কৃষিকাজ, পুলিশ, সেনা, আধাসেনা-সহ অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত তাঁরা অনেক বেশি সুস্থ।

অল্প বয়সি মহিলাদের ভেতর শারীরিক সমস্যা বাড়ছে কেন?

চিকিৎসকদের মতে মহিলাদের এই ধরনের সমস্যার পেছনে আছে সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাস। পাশাপাশি কারণে অকারণে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকা, মোবাইলে আসক্তি, অলসতা। দেখা যাচ্ছে নীচু ক্লাসের স্কুলের কাছেপিঠে পড়ুয়াদের মায়েদের ভিড়। তাদের এক জায়গায় বসে থাকা, রাস্তায় বেড়ানো, মোবাইল ঘেটে চলা, ফুটপাতের দোকানে নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, পরচর্চা, ঈর্ষা, বিভিন্ন শপিং মলে অকারণে সময় কাটিয়ে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলি নষ্ট করে চলেছেন।

পুরনো কথাই আবার বলতে হচ্ছে, শরীর ও মন সুস্থ রাখতে নিজেকে বদলাতেই হবে। জীবন তো একটাই, তাই সুস্থ ভাবে আনন্দে বাঁচলে জীবনটা উপভোগ করা যায়। পাশাপাশি সকলের জীবনেই অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে সেগুলোও সুষ্ঠুভাবে পালন করা জরুরি। কিন্তু শরীর সুস্থ না থাকলে সবই বৃথা।

ডাক্তার, হাসপাতাল থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হলে কিছু মন্দ অভ্যাস পরিত্যাগ এবং শরীরচর্চা করতেই হবে। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও নিজের জন্য সময় দিতে হবে। যতটা কম মোবাইল ব্যবহার করা এবং পরিমিত ঘুমের জন্য সময় রাখতে হবে।

এই সবই সকলের জানা, কিন্তু মেনে চলাটাই কঠিন। অজুহাত হলো— সময় নেই। সত্যিই মানব জীবনে সময় খুবই কম। কিন্তু কাজ করতে করতে হালকা শব্দ করে স্পিকারে পছন্দের গান শোনা, বাইরের খাবারের পরিবর্তে ঘরে তৈরি পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, ফাস্টফুড, কারখানায় তৈরি বোতলের ঠাণ্ডা পানীয়ের পরিবর্তে মরসুমি ফল খাওয়া, পরচর্চা না করে সুযোগ পেলেই বই পড়া অথবা ঘরের বারান্দাতেই দু'চারটি ফুলের গাছ লাগিয়ে নিয়মিত পরিচর্যা কি খুবই সময় লাগে?

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, অকারণে বেহিসেবি জীবন না কাটিয়ে একটু হিসেব করে সময় ব্যয় করলে অকারণ চিন্তামুক্ত জীবন কাটানো যেতেই পারে। তিনি বলেন, আজকের অল্পবয়সি মেয়েরা আগামী দিনের মা। তাই তাদের মায়েদের এবং অবশ্যই বাবাদেরও দায়িত্ব নিতে হবে আগামী প্রজন্মকে সুস্থ করে তোলার। এখনকার সময়ে সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সবাই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যায়, ফলে যে কোনো রকম কাজের জন্য প্রস্তুতিও নিয়ে থাকে। ঘরে হয়তো তাদের সঠিক পথ দেখানো হয় কিন্তু অনেক সময়ই বাইরে গিয়ে সেই আগল ছিঁড়ে যায়। তাই ঘর থেকেই বাইরের সম্পর্কে সচেতন করতে হয় সন্তানদের। লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক বা খেলাধুলার জগতে সন্তানদের নিয়ে আসা প্রয়োজন। স্বামী অচিন্ত্যানন্দজীর কথায়, সনাতনী ভারতীয় আদর্শে গড়ে তোলা ভালো মনের ও সুস্থ শরীরের সন্তান মানেই আগামী দিনের সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠন হওয়া। আদর্শ সমাজ মানেই তো উন্নত দেশ। □

গরমে সুস্থ থাকার উপায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

● সাধারণত এই তীব্র গরমে মানুষের কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে?

পরিবেশের বর্ধিত তাপমাত্রার কারণে শরীরে বিভিন্ন রকম লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তার হিট ক্র্যাম্প হলো এক ধরনের সমস্যা যেখানে মানুষ অত্যধিক পরিশ্রমের কারণে মাংসপেশিতে ব্যথা অনুভব করেন এবং তীব্র তাপমাত্রার কারণে অনেক সময় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, তাকে হিট সিনকোপ বলে। এছাড়া সব থেকে খারাপ পরিস্থিতি হলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিভিন্ন শরীরতন্ত্র বিকল হয়ে যেতে পারে। তাকে হিট স্ট্রোক বলা হয়।

● সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক কাদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা?

হিটস্ট্রোক যেকোনো বয়সের মানুষেরই হতে পারে। বয়স্ক মানুষ এবং ছোটো ছোটো শিশুরা বেশি আক্রান্ত হয় তুলনামূলক ভাবে তরুণদের থেকে। যে সমস্ত মানুষ আনুষঙ্গিক দীর্ঘদিনের রোগে আক্রান্ত যেমন যাদের ভারী শরীর, হৃদরোগে আক্রান্ত, সুগার রোগী, স্নায়ুরোগে আক্রান্ত, মানসিক রোগী, শয্যাশায়ী, তাঁদের ক্ষেত্রে হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিছু কিছু ওষুধ যেগুলো হৃদরোগ, মানসিক রোগ এবং কিডনি সমস্যাজনিত কারণে চিকিৎসকরা দিয়ে থাকেন, সেই সমস্ত ওষুধ কেউ যদি নিয়মিত খেয়ে যান, সেগুলো হিট স্ট্রোকের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তোলে, বিশেষত যে সমস্ত ওষুধ শরীর ফুলে যাওয়া বা শ্বাসকষ্টের জন্য শরীর থেকে জল বের করতে সুবিধা করে এবং মানসিক রোগের ওষুধ যেগুলো শরীরের ঘাম কম করে দেয়। অনেক সময়, অনেক বাবা-মা তাদের বাচ্চাকে রাস্তার ধারে পার্কিং করা গাড়িতে এসি না চালিয়ে রেখে যান, এতে বাচ্চারা প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে পারে। এমন অনেক ঘটনার কথা জানা যায় যাতে বাচ্চারা তীব্র গরমে হিটস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। তাই এ বিষয়ে সকলকে সাবধান থাকতে হবে।

• সানস্ট্রোক বা হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা কী কী হতে পারে?

• বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল ঘটনাস্থল থেকে অনেকটাই দূরে। এই পরিস্থিতিতে সময়ের মূল্য অনেক বেশি। তাই খেয়াল রাখতে হবে, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসার আগে প্রাথমিক চিকিৎসাটা যেন ঘটনাস্থলেই হয়।

• আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকবে রোগী যদি জেগে থাকে এবং জল পান করতে পারে তাহলে তাকে যতটা সম্ভব জল পান করানো।

• ওআরএস যদি থাকে তাহলে সেটা পান করানো।

• সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে আসা এবং চলন্ত পাখার সামনে রাখা। যদি বাতানুকূল পরিবেশের ব্যবস্থা থাকে তার মধ্যে নিয়ে আসা।

• শরীর থেকে জামা কাপড় সব সরিয়ে ফেলতে হবে।

• কেউ যদি তীব্র গরমে কাজ করতে করতে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী করবেন?

• প্রাথমিক কর্তব্য হলো তাকে চিৎ করে শুইয়ে পা দুটো উপরের দিকে তুলে রাখা। এতে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে, যদি এটা সিনকোপ জনিত কারণে হয় এবং সেক্ষেত্রে রোগীকে মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যায় খুব সহজেই।

• কোনো ব্যক্তি অজ্ঞান অবস্থায় থাকলে ভুল করেও জল খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। কারণ সেই জল শ্বাসনালীতে চলে গিয়ে রোগী মারা যেতে পারে।

• কারও যদি খিচুনি হয় তাহলে মুখে জুতার গন্ধ শুকাবেন না। বরং তাকে শীঘ্রই নিকটবর্তী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নিয়ে যান।

তীব্র গরমে শরীরের অতিরিক্ত উষ্ণতা কম করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে।

• প্রথমত যদি বরফের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে পারা যায় তাহলে বরফ কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে বগলের চারপাশ, বুকের চারপাশ, নাভিতে প্রতিনিয়ত চেপে ধরে রাখুন।

• ফ্রিজের ঠাণ্ডা জল যদি পাওয়া যায় তাহলে সারা শরীর ভিজিয়ে দিন এবং মুছে নিন।

• এই পদ্ধতি করতে থাকুন যতক্ষণ না পর্যন্ত শরীরের তাপমাত্রা ১০১ ডিগ্রির নীচে না নামে বা রোগীর শরীর কাঁপতে থাকে।

• সঙ্গে সঙ্গে ভেজা শরীরের উপর দিয়ে পাখার হাওয়া চালিয়ে যান।

মনে রাখবেন, একটা প্রচলিত কথা 'কুল ফার্স্টটান্সপোর্ট সেকেন্ড'। প্রাথমিক চিকিৎসা না দিয়ে কখনোই তড়িঘড়ি করবেন না হসপিটালে নিয়ে আসার জন্য। বাড়িতে যদি ট্যাপ ওয়াটার বন্দোবস্ত থাকে তাহলে রোগীকে তার নীচে শুইয়ে জল ঢেলে যান। রোগী যদি জেগে থাকে এবং হাঁটতে পারে তাহলে পুকুরের জলে আংশিক ডুবিয়ে রাখলে শরীরের তাপমাত্রা তাড়াতাড়ি কমে আসে। কম্বল ঠাণ্ডা ফ্রিজের জলে ভিজিয়ে শরীরের ওপর রেখে দিয়ে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর তুলে নিয়ে আবার ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে শরীরে রাখলে তা খুব উপকারী। এই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর রোগীকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসুন যেখানে স্যালাইন দিয়ে শরীরের জলের ঘাটতি এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেটা বিকল হওয়ার সম্ভাবনা সেটার অনুসন্ধান করা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায়।

• সানস্ট্রোক বা হিটস্ট্রোক যাতে না হয় তার জন্য কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত?

• তীব্র গরমে ভারী এবং সময়সাপেক্ষ কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু যদি উপায় না থাকে তাহলে একটানা কাজ না করে মাঝে বিশ্রাম নিন।

• পর্যাপ্ত জল পান করুন যাতে আপনার শরীরে জলের ঘাটতি না পড়ে।

• ভালো পুষ্টিকর খাবার খান।

• মদ এবং অন্যান্য নেশা থেকে বিরত থাকুন।

• যে সমস্ত রোগী দীর্ঘদিন ধরে হার্টের রোগ বা মানসিক রোগ বা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত এবং তার জন্য ওষুধ খেতে হয় তারা চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ নিন এবং জেনে নিন কীভাবে এই তীব্র গরমে সুস্থ থাকা যায়।

• আমাদের অতিরিক্ত যত্নবান হতে হবে বয়স্ক ও ছোটো ছোটো শিশুদের প্রতি বেশি।

• যাদের ভারী কাজ করা অভ্যাস নেই তারা যেন হঠাৎ করে এই তীব্র গরমে ভারী কাজ দীর্ঘ সময় ধরে না করেন। ধীরে ধীরে নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলুন তারপর কাজের সময়কে দীর্ঘায়িত করুন।

• ঘন ঘন কফি খাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

• বাড়িতে থাকুন বা বাইরে চলাফেরা করুন বা কাজ করুন সব সময়ই হালকা জামাকাপড় পরার চেষ্টা করুন।

• তীব্র দাবদাহে রৌদ্রে না কাজ করে দিনের প্রথমে ভারী কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন।

• ঠাণ্ডা জলে সহ্য হলে বারবার স্নান করুন।

• বাড়িতে বাতানুকূলের ব্যবস্থা থাকলে তীব্র উষ্ণতায় সেখানে বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন।

• ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন। □

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ট্রাস্টের 'প্রেসিডেন্ট নিযুক্তীকরণ' অনুষ্ঠান

কলকাতা মহানগরীর চালতাবাগান-স্থিত অত্যন্ত প্রাচীন হরিসভা— 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী', যার নামেই রাস্তার নাম— বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলকাতা-৬। বহু আন্দোলনের সাক্ষী কলকাতা মহনগরী, তা ধর্মীয় হোক বা রাজনৈতিক। কলকাতায় যখন ব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম ভাবধারার বাড়বাড়ন্ত, ঠিক তখনই প্রভু নিত্যানন্দ বংশীয় প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী-সহ বঙ্গের বরিষ্ঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ সনাতন হিন্দুধর্মের পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে মন্দির-সহ একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ব্রতী হন। কাশিমবাজার অধিপতি মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর বিপুল অর্থ দানে মন্দির-সহ নাটমন্দির নির্মিত হয় প্রায় ১১৫ বছর আগে। এই মন্দিরের জমি দান করেন নিতাই চরণ লাহা এবং বহু সাধারণ নাগরিক। শ্রীশ্রী পাঠবাড়ীর আশ্রমের মোহন্ত মহারাজ রাধারমণ দাস বাবাজী থেকে শুরু করে মোহন্ত সীতারাম দাস বাবাজীর স্মৃতিধন্য এই মন্দির। সীতারাম দাস বাবাজী 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী'র নামকরণ করেছিলেন— 'গৌরাঙ্গ মিলন মন্দির'। একসময় এখানে টোল ও চতুষ্পাঠী-সহ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল, যার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় ড. গৌরীনাথ শাস্ত্রী। এছাড়া এখানে গৌড়ীয় শাস্ত্রীয় পঠনপাঠনের জন্য তৎকালীন ইংরেজ শাসকের অর্থানুকূল্যে মন্দিরের দ্বিতল তৈরি করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে নাটমন্দির পুনরায় সংস্কার করা হয়।

২০১৯ সালের শেষে অছি পরিষদ পুনর্গঠিত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নেতৃত্বে। বর্তমানে অছি পরিষদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন মহাউদ্ধারণ মঠের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মধুসূদন পাল, ডাঃ সঞ্জয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, আইনজীবী দেবযানী ঘোষাল ও বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রান্তিকা ভট্টাচার্য্য। গত ৩০ মার্চ, চৈত্র শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী ট্রাস্টের একাদশ প্রেসিডেন্ট (সভানেত্রী) নিযুক্ত হলেন— শ্রীপাট খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দিরের সেবায়েত, নিত্যানন্দ প্রভুর বংশজা, প্রভু পাদ যুগল কিশোর গোস্বামীজীর পৌত্রী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী গোস্বামী (রাজরাজেশ্বরী মা)। মাতাজীর হাতে নিযুক্তিপত্রটি তুলে দিয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং দশনামী পরম্পরার সন্ন্যাসীদের পক্ষ থেকে মাতাজীকে অভিনন্দন জানান কাঞ্চী কামকোটি মঠের সন্ন্যাসী স্বামী কৃষ্ণানন্দ তীর্থ মহারাজ। শাল ও উত্তরীয় পরিয়ে, তাঁর হাতে পঞ্চ ফল ও মিষ্টান্ন তুলে দিয়ে মাতাজীকে সংবর্ধনাও জানান দুই বরেণ্য সন্ন্যাসী। মাতাজী একজন শিক্ষিকা। তিনি ডিআইএস স্কুল (হাওড়া)-র পূর্বতন প্রধান শিক্ষিকা ও ডিআইএস গোষ্ঠী পরিচালিত স্কুলগুলির ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিক ইনচার্জ। শিক্ষাজগতের সঙ্গে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের অন্যতম পথপ্রদর্শক। অছি পরিষদের নবনিযুক্ত সভানেত্রী হিসেবে তাঁর বক্তব্যে মাতাজী জানান যে, এই মন্দিরের দোতলায় একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার ও বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংরক্ষিত রয়েছে, যার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। কোভিড অতিমারীর পর থেকে মন্দির ট্রাস্টের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করেছে। এদিন নিজগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই মন্দিরের মহতী কাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সহ আপামর হিন্দুসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুরোধও তিনি করেন।

স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার আবরণ উন্মোচন।

‘স্বস্তিকা’র বাংলা নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন এবং ‘সংস্কার

গত ১১ এপ্রিল উত্তর কলকাতায় মানিকতলা-স্থিত কেশব ভবনে আয়োজিত হয় জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘স্বস্তিকা’র বাংলা নববর্ষ (১৪৩৩ বঙ্গাব্দ) সংখ্যার উন্মোচন এবং ‘সংস্কার ভারতী’র সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান। সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের দ্বারা আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিনের নববর্ষ আবাহন উৎসবের শুভারম্ভ হয়। ভাবসঙ্গীত, উদ্বোধনী সঙ্গীত ও সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হওয়ার পর অনুষ্ঠানমঞ্চে অতিথিদের আহ্বান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক ও বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ মধুসূদন পাল, প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশিস গিরি। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ার স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ এবং সম্মানীয় অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন ‘সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ’-এর কার্যকরী সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য্য। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু।

সংস্কার ভারতী-র সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর সভাপতি, প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা ও সম্মানীয় অতিথি ভারতমাতার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। সোমা চক্রবর্তীর কণ্ঠে দীপমন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তাঁরা প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। মঞ্চাসীন অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বতন প্রচারক তথা মালদহ বরেন্দ্র মহকুমার পূর্বতন সঙ্ঘচালক প্রদীপ ঘোষ স্মরণে এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা ১ মিনিট নীরব প্রার্থনা করেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সাপ্তাহিক ‘স্বস্তিকা’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং কলকাতা মহানগরের বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকা-র প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল। তাঁর ভাষণের পর মঞ্চস্থ অতিথিবর্গ বঙ্গীয় নববর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এবং বিশিষ্ট লেখক-লেখিকাদের রচিত প্রবন্ধ সংবলিত ‘স্বস্তিকা’র ১৩ এপ্রিল, ২০২৬ সংখ্যাটির আবরণ উন্মোচন করেন। এই সংখ্যার আলোচ্য বিষয় ছিল— একদা বঙ্গ তথা ভারতের নবজাগরণের নেতৃত্বদানকারী বাঙ্গালির সাম্প্রতিক অবনমনের কারণ এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়। পত্রিকাটির নববর্ষ সংখ্যা উন্মোচনের পর অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের করকমলে সংস্কার ভারতী-র সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ হয়। এই বর্ষের দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় হলো— ‘সার্ধশতবর্ষের শুভালোকে বন্দে মাতরম্’। সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর বিষয় আলোচনা-সহ বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্ক-সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ উপস্থাপন করেন ‘সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ’-এর সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত। প্রবীণ সাংবাদিক তথা বিশিষ্ট লেখক শ্রী নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই বছরের ‘স্বস্তিকা লেখক সম্মাননা’ প্রদান করা হয়। তাঁকে তিলক পরিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন স্বস্তিকার বিশিষ্ট লেখিকা ড. রাজলক্ষ্মী বসু। উত্তরীয়, মিষ্টান্ন, পঞ্চফল, শাল ও পুষ্পস্তবক সহকারে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাঁকে উত্তরীয় পরিয়ে দেন ‘স্বস্তিকা’র প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল। শাল অর্পণ করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক সুজিত রায়। তাঁর হাতে পঞ্চফল ও মিষ্টান্ন তুলে দেন ‘স্বস্তিকা’র অন্যতম নির্দেশক অরিন্দম সিংহরায়। তাঁর হাতে মানপত্র অর্পণ করেন ‘স্বস্তিকা’র সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। তাঁর দীর্ঘ

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ।

ভারতী'র সাংস্কৃতিক দেওয়ালপঞ্জীর লোকার্পণ অনুষ্ঠান

কর্মজীবন সংবলিত মানপত্রটি পাঠ করে শোনান সঞ্চিতা সরকার। তাঁর বক্তব্যে নিজস্ব সাংবাদিক জীবন এবং 'স্বস্তিকা'র সঙ্গে তাঁর সুদীর্ঘ যোগসূত্র তুলে ধরেন শ্রীভট্টাচার্য। 'স্বস্তিকা লেখক সম্মাননা (১৪৩৩ বঙ্গাব্দ)' প্রাপ্ত লেখক স্বস্তিকা কর্তৃপক্ষ ও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। 'স্বস্তিকা'র নবাঙ্কুর বিভাগে সর্বাধিক অংশগ্রহণকারী, ষষ্ঠশ্রেণীর ছাত্র দীপমাল্য সাউকে এই বছরের 'ক্ষুদে লেখক সম্মাননা' প্রদান করা হয়। ছোট্ট দীপমাল্যকে উত্তরীয় পরিয়ে ওর হাতে মিষ্টান্ন তুলে দেন সংস্কার ভারতী-র কার্যকর্ত্রী তনুশ্রী মল্লিক। 'নবাঙ্কুর বিভাগের ক্ষুদে লেখক সম্মাননা' স্বরূপ বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ— হেমেন্দ্র কুমার রায় রচিত 'বিমল-কুমার সমগ্র' দীপমাল্যর হাতে তুলে দেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি-র বর্ষীয়ান কার্যকর্ত্রী মহুয়া ধর।

এরপর প্রতিমা মণ্ডলের কণ্ঠে একক গানের পর অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ড. জিষ্ণু বসু বঙ্গভূমি ও বাঙ্গালির অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য আলোচনা-সহ একদা বঙ্গ তথা ভারতের নবজাগরণের নেতৃত্বদানকারী বাঙ্গালির সাম্প্রতিক অবনমনের কারণ এবং তার থেকে উত্তরণের উপায়ের বিষয়টি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তাঁর বক্তব্যের রেশ ধরেই সভাপতির ভাষণ দান করেন ডাঃ মধুসূদন পাল। দেশভাগ-সহ বাঙ্গালি জাতির অস্তিত্ব সংকটের বিভিন্ন দিক এবং এই সমস্যার সমাধান বা বিপন্মুক্তির উপায়গুলি তিনি সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার

অনুষ্ঠানের উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর একাংশ।

শ্রী নন্দলাল ভট্টাচার্যকে স্বস্তিকা লেখক সম্মানা তুলে দিচ্ছেন সুজিত রায়।

দীপমালা সাউকে স্বস্তিকার ক্ষুদে লেখক সম্মানা তুলে দিচ্ছেন মহুয়া ধর।

জন্য— সংস্কার ভারতী-র সঙ্গীতগোষ্ঠীর মাতৃমণ্ডলী, অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, পাঠক প্রমুখ বিশিষ্টজন ও ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতিকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন 'স্বস্তিকা'র মুখ্য ব্যবস্থাপক জয়রাম মণ্ডল। তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে রাষ্ট্রগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংস্কার ভারতী-র কার্যকর্ত্রী দোলন চক্রবর্তী এবং 'স্বস্তিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বস্তিকার বহু বিশিষ্ট লেখক, পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে এদিনের সভাস্থলটি ছিল পরিপূর্ণ।

গঙ্গাজলঘাটি কৌশিক স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরে বর্ষবরণ উৎসব

গত ১৫ এপ্রিল বাংলা নববর্ষ তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী সূচনালগ্নকে কেন্দ্র করে এক মহৎ ও সংস্কারমুখী উদ্যোগের সাক্ষী থাকল বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটি কৌশিক স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দির। সমাজের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটানোর পাশাপাশি তাদের ভারতীয় সংস্কার, মূল্যবোধ ও জাতীয় চেতনার আলোকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশুমন্দিরের উদ্যোগে এদিন অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণাঢ্য বর্ষবরণ উৎসব।

ভারতীয় আদর্শ ও শিক্ষাচিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত এই শিশুমন্দিরের অধীনে থাকা দু'টি 'শিশু সংস্কার কেন্দ্র'— 'ভোলা গিরি শিশু সংস্কার কেন্দ্র' ও 'বিষহরি শিশু সংস্কার কেন্দ্র'-এর ছোটো ছোটো শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। মূলত সমাজের প্রান্তিক পরিবারের শিশুদের শিক্ষাদানের সঙ্গে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই এই কেন্দ্রগুলির প্রধান লক্ষ্য। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচনায় ছিল প্রভাত ফেরী এবং একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা— যেখানে শিশুদের পরিবেশিত দেশাত্মবোধক গান, নৃত্য ও আবৃত্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির চিরন্তন ধারাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। পাশাপাশি শিশুদের মায়েদের জন্য আয়োজন করা হয় এক বিশেষ পরামর্শমূলক অধিবেশন, যেখানে সন্তানদের সুশিক্ষা, চরিত্র গঠন ও জাতীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল শিশুদের হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া, যা তাদের উৎসবের আনন্দকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। সবশেষে উপস্থিত প্রত্যেক শিশু ও তাদের মায়েদের জন্য মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করা হয়, যা পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সামাজিক বন্ধনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে ওঠে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিশুমন্দিরের সহ-সভাপতি বাদল চন্দ্র মাজী ও সম্পাদক নির্মল কুমার সিংহ-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের উপস্থিতি ও উৎসাহদান অনুষ্ঠানে এক অন্য মাত্রা যোগ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রাক্তন সৈনিক ও সমাজকর্মী বিমান সিংহ বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ শুধু উৎসব উদ্‌যাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে আগামী প্রজন্মকে গড়ে তোলার এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

সমাজের প্রান্তিক শিশুদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে আনন্দ, সংস্কার, সহমর্মিতা ও জাতীয় চেতনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বেহালায় বিরাট হিন্দু সম্মেলন

গত ২৯ মার্চ দক্ষিণ কলকাতার বেহালায় কেএফআর রেলের মাঠে আয়োজিত হয় 'বিরাট হিন্দু সম্মেলন'। শঙ্খনাদ, শিঙা গর্জন, উলুধ্বনি, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীকৃষ্ণ উদ্ঘোষ ও প্রবল হর্ষোল্লাসের মধ্যে দিয়ে এদিন বিরাট হিন্দু সম্মেলনের শুভারম্ভ হয়। গৈরিক পতাকা শোভিত, গৈরিক কাপড়ে মোড়া মঞ্চে দাঁড়িয়ে এদিন অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন ত্যাগ, বৈরাগ্যে দীক্ষিত সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীবৃন্দ। এই সন্তসমাজের মধ্যমণি রূপে বিরাজ করছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখার প্রধান, সর্বজনপ্রিয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ। সংস্কার ভারতী, বাঁশদ্রোণী শাখার শিল্পীবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে বলিষ্ঠ, দেশাত্মবোধক, জাগরণী গান, ছোট্ট বালিকা কুমারী বেদপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ এবং তারপর সুগায়িকা রাখী চৌধুরীর নেতৃত্বে, সম্মেলনে উপস্থিত সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর কণ্ঠনিঃসৃত মাতৃবন্দনার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মূর্ছনায় এই বিশাল ময়দান এদিন মুখর হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সন্তমণ্ডলীকে সুদৃশ্য উত্তরীয় সহকারে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। উপস্থিত মাতৃমণ্ডলী পুষ্পবৃষ্টি ও উলুধ্বনি সহকারে সন্তমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা জানান। এই সম্মেলনের এক ও অদ্বিতীয় বক্তা পূজ্যপাদ স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ তাঁর দীর্ঘ, উদ্দীপনাময় ও প্রেরণাদৃপ্ত বক্তব্যে সনাতন হিন্দুধর্মের মর্মার্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যার সঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশকে পাথেয় করে, সমগ্র সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে, আসন্ন ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানান। মঞ্চে শোভিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতির বিষয়ে উল্লেখ করে, মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন বঙ্গের প্রথম প্রতিবাদী সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যদেব এবং আধুনিক ভারতের বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামীজীর জাগরণের বাণীতে--- জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত হওয়ার আহ্বান তিনি জানান। 'এটাই শেষ ট্রেন, মিস করলে প্ল্যাটফর্মেও জায়গা হবে না'— এটাই ছিল পূজনীয় মহারাজের বক্তব্যের নির্যাস। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম— এই দুই বাঙ্গালি কবির প্রেরণাদায়ী কবিতার বাণীকে পাথেয় করে মহারাজ তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন এই বলে যে, 'দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে, প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' বেহালায় অনুষ্ঠিত এই হিন্দু সম্মেলনের মূল উদ্যোক্তা হলেন পূর্ব বেহালার মুচিপাড়া অঞ্চল নিবাসী প্রবীণ স্বয়ংসেবক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরই উদ্যোগে এবং সহ-কার্যকর্তাদের অকুণ্ঠ প্রচেষ্টার ফল হলো এই বহু আকাঙ্ক্ষিত হিন্দু সমাবেশ। এদিনের অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব মজুমদার।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'

গত ১৫ এপ্রিল গৌড় বঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শশাঙ্ক প্রবর্তিত বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করে বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ। এতদুপলক্ষ্যে বিগত বছরগুলির মতো এবারও বঙ্গীয় নববর্ষের দিন কলকাতার রাজপথে দেখা গেল মহা সমারোহে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'। এদিন বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে কলকাতায় রবীন্দ্র সদনের বিপরীতে মোহর কুঞ্জের সামনে থেকে ধ্বজ, মঙ্গল ঘট, ঢাক-ঢোল, শ্রীখোল, করতাল, মন্দিরা, চামর, গৌড়ীয় নৃত্য, কীর্তন ও নট-নটী সহযোগে এই মঙ্গল শোভাযাত্রাটি আয়োজিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনের আবহে কলকাতায় এখন রোজই মিছিল। কিন্তু এতো মিছিল নয়— সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, করতাল, রায়বেঁশে, গৌড়ীয় নৃত্য, বাউল গান, কীর্তনের তালে তালে পথ হেঁটেছেন এদিন বহু মানুষ। শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রযুক্তিবিদ, ক্রীড়াবিদ— কে ছিলেন না এই শোভাযাত্রায়। গৌড়াধিপতি মহারাজা শশাঙ্কের চিত্র সমন্বিত একটি দেওয়াল পঞ্জিকারও প্রকাশ হয় এই শোভাযাত্রায়। প্রবুদ্ধ বাঙ্গালি সমাজের আর্থিক অনুদানে প্রকাশিত এই দেওয়াল পঞ্জিকা পথ চলতি মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

বাঙ্গালির কাল পঞ্জিকা 'বঙ্গাব্দ'-এর বয়স এখন ১৪৩৩। মহারাজা শশাঙ্কের রাজ্যাভিষেকের সময়কালকে সূচিত করে বাঙ্গালির নিজস্ব এই কাল পঞ্জিকা 'বঙ্গাব্দ'। পয়লা বৈশাখ মানেই নতুন বছর, নতুন করে পথ চলা। নতুন জামাকাপড়, লক্ষ্মী-গণেশের পূজা, হালখাতা, চিৎপুর-বইপাড়া সরগরম। একমাস ধরে দেবাদিদেব ভগবান শিবের তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনায় সন্ন্যাসী বাঙ্গালি পর্ব শেষ হয় চৈত্র সংক্রান্তির গাজন ও চড়কের মেলায়। পরের দিন নতুন বছরকে স্বাগত জানাতেই তো অনুষ্ঠানের আয়োজন। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে কুচক্রী ষড়যন্ত্রীরা বাঙ্গালির নিজস্ব এই কাল পঞ্জিকার আবাহন উৎসবের কৃতিত্বে নাম জুড়েছে মুঘল বাদশা আকবরের। বঙ্গভূমি বা বাঙ্গালি সমাজের সঙ্গে ন্যূনতম যোগাযোগ না থাকা আকবরের নামকে প্রতিষ্ঠা দিতে মরিয়া এই দুষ্টচক্রের মূল উদ্দেশ্যই হলো বাঙ্গালির প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কেড়ে নিয়ে তাতে মরু সংস্কৃতির ছোঁয়া দেওয়া।

কলকাতা মহানগরের বুকে কেন্দ্রীয়ভাবে 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' আয়োজনের উদ্দেশ্যই হলো আরববাদীদের এই ষড়যন্ত্রে আঘাত হানা। 'বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ' প্রায় এক দশক ধরে বাঙ্গালির সনাতনী গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টায় কাজ করে চলেছে। কলকাতার রবীন্দ্র সদন চত্বরে মোহর কুঞ্জের সামনে থেকে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা হলো বাঙ্গালির হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করার এক মহতী প্রয়াস, যাকে সাধুবাদ জানান এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী অসংখ্য সনাতনী।

'বন্দে মাতরম্'-এর সার্ধশতবর্ষ স্মরণ, মনন ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠান

গত ১২ এপ্রিল ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং 'বিদ্যার্থী বিকাশ ট্রাস্ট'-এর সহযোগিতায় বিধাননগরে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের সভাগৃহে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন, দেশমাতৃকার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং সৌরদীপ রায়ের কণ্ঠে সম্পূর্ণ 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। 'বন্দে মাতরম্ সার্ধশতবর্ষে : স্মরণে ও মননে'-শীর্ষক এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন— 'দ্য রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক'-এর সেক্রেটারি স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ড. সরূপপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যার্থী বিকাশ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে গোবিন্দ নায়েক, স্বাধীনতা

সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পৌত্রী মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তর ভ্রাতুষ্পৌত্র কৌশিক দত্তগুপ্ত, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র পরিচালক শীলা দত্ত, বিশিষ্ট লেখক অশোক কুমার মুখোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক দেবারতি মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত প্রমুখ বিশিষ্টজন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে স্বাধীনতা সংগ্রামে 'বন্দে মাতরম্'-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বরেণ্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ ও অধ্যবসায় হতে বর্তমান প্রজন্মকে শিক্ষাগ্রহণের আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অংশ হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবীদের পরিবারবর্গকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেন, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষ, বিপ্লবী ধরণীনাথ গুপ্ত, বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী (যিনি আন্দামান সেলুলার জেলে ১৪ বছর কারাবন্দি ছিলেন) এবং বিপ্লবী বিশ্বনাথ মল্লিকের পরিবারের সদস্য-সদস্যা-সহ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উপেক্ষিত অনেক বিপ্লবী পরিবার এদিনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকের পক্ষ থেকে প্রত্যেকের হাতে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পক্ষ থেকে স্মারক তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি, ইতিহাস গবেষক, সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ ও সাধারণ নাগরিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ১৩৯তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ এপ্রিল বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি-র উদ্যোগে মধ্য কলকাতা-স্থিত মহাজাতি সদনে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের ১৩৯তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সদস্য-সদস্যারা উপস্থিত হয়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপ্লবী বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, বিপ্লবী সন্তোষ কুমার মিত্র প্রমুখ দেশবরেণ্যদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের জাতীয় অধিবেশনের সময় অভ্যর্থনা সমিতি-র সভ্য ও সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে তিনি বঙ্গপ্রদেশের নবম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রূপে কারাবরণ করেন। ১৯৩৩-১৯৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতা কর্পোরেশনের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন। সুভাষচন্দ্র পরিচালিত 'মহাজাতি সদন' নির্মাণকল্পে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি 'সুভাষ কংগ্রেস ফান্ড'- এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪০ সালে তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের 'মধ্য কলকাতার প্রথম সভাপতি' নির্বাচিত হন।

এদিনের অনুষ্ঠানে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের জীবনী পাঠ করেন তাঁর নাতি তরুণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাসের সদস্যা এমিলি বিশ্বাস, কল্পনা বিশ্বাস ও আল্পনা রায়। বিপ্লবী পরীক্ষিৎ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রবধূ মঞ্জু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রপৌত্রী রমা রায়, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের কন্যা মিতালী সরকার, 'ভারত সভা'র সদস্য

হিমাংশু সাহা, মহারাজ সর্দার, সুরজিৎ দেবনাথ প্রমুখ বিশিষ্টজন। অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন বিউটি দাস, ধ্রুব হালদার ও 'মরুবিজয় কালচারাল গ্রুপ'-এর শিল্পীবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি-র সহ-সভাপতি গোপাল চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি-র সম্পাদক তথা বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের সম্পর্কে নাতি তরুণ বিশ্বাস।

সাধুসন্তদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে 'প্রতিবাদী সন্ত পদযাত্রা'

গত ১০ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতায় ভবানীপুর-স্থিত ভোলা গিরি আশ্রমে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে চড়াও হয় তৃণমূলি হার্মাদ বাহিনী। গৈরিক বসনধারী, সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের শারীরিক নিগ্রহ, অশ্রাব্য গালিগালাজ, মিথ্যা অপবাদ, হত্যার হুমকি এবং আশ্রমের বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলে তারা। তাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে গত ১৯ এপ্রিল কলকাতার রাজপথে তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ে বঙ্গীয় সাধুসন্ত সমাজ। সাধুসন্তদের ওপর হামলার প্রতিবাদে এদিন 'বঙ্গীয় সন্ত সমাজ'-এর আহ্বানে সংঘটিত হয় 'প্রতিবাদী সন্ত পদযাত্রা'। এদিন বালিগঞ্জ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে সাধুসন্তদের একত্রীকরণ হয়। সাধুসন্ত ও অসংখ্য সনাতনীদের এই পদযাত্রা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে শুরু হয়ে ভবানীপুরের ভোলা গিরি আশ্রম পর্যন্ত পৌঁছায়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, শ্রীধাম মায়াপুরের সন্ন্যাসী শ্রীপাদ জগদার্তিহা দাস প্রভু, রিষড়া প্রেম মন্দির আশ্রমের সন্ন্যাসী শ্রীমৎ নির্গুণানন্দজী মহারাজ, হরিদ্বার ভোলা গিরি আশ্রমের সন্ন্যাসী মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী তেজসানন্দজী মহারাজ, ভবানীপুর ভোলা গিরি আশ্রমের মোহন্ত বিষ্ণু মহারাজ, ধ্যানব্রতানন্দজী মহারাজ-সহ জুনা আখড়ার ৫০ জন নাগা সন্ত এবং অন্যান্য আখড়া ও মঠ-মন্দির থেকে অসংখ্য সাধুসন্ত এই প্রতিবাদী পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন। পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)-এর সংগঠন মন্ত্রী মানিকচন্দ্র পাল ও সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রনাথ দাস। এই প্রতিবাদ কর্মসূচীতে উপস্থিত সাধুসন্তদের পক্ষ থেকে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ কঠোর ভাষায় এই অন্যায়ের নিন্দা করেন এবং ঘোষণা করেন— ধর্মের ওপর আক্রমণ বরদাস্ত করা হবে না। সাধুসন্তদের অপমান মানে সমগ্র সনাতনী হিন্দুসমাজের অপমান। সনাতনের ওপর আঘাত মানে সমাজের অস্তিত্বের ওপর আঘাত। বঙ্গের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ধর্ম রক্ষা এবং সাধুসন্তদের মর্যাদা রক্ষায় সমগ্র সমাজকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান পূজনীয় মহারাজ। পদযাত্রা ভোলা গিরি আশ্রমে পৌঁছানোর পর পূজ্য সাধুসন্তরা আশ্রমের সন্তদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন প্রদান করেন।

জাতিকে মহান করেছে হিন্দু ধর্মের দশবিধ সংস্কার

ড. অনিমেষ চক্রবর্তী

পরম পবিত্র কর্মময় ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে সমগ্র হিন্দুজাতির মধ্যে সামগ্রিক ও সম্মিলিত আকারে এক অভ্যুদয় ও জাগরণ সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে সংযম সদাচার এবং বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করা ও করতে সহায়তা করার মধ্যেই ভারতবর্ষে মানবজাতির ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতি ও অভ্যুদয়ের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

হিন্দু জনসমাজের ধর্মীয় সংস্কারের পরিচায়ক ও সর্ববিধ মঙ্গলের পথপ্রদর্শক অবশ্যই বেদাদি ধর্মশাস্ত্র। সুতরাং হিন্দুধর্ম অনুসারে স্বাজাত্যবোধসম্পন্ন মনুষ্যত্ব লাভের জন্য শরীর ও মনের শুদ্ধি সম্পাদন ও যথাযথ সংস্কারের প্রয়োজন। সোনা, রুপো প্রভৃতি ধাতুর যেমন আগুনের উত্তাপে তাদের মালিন্য দূর হয়ে যায় ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরকম মানুষও সংস্কারসম্পন্ন হলে তার শরীর ও মনের মলিনতা দূর হয়ে যায়। তার নানা সদ্‌গুণের বিকাশ হয় এবং ভগবদ্‌ভক্তি জাগরুক হয়।

হিন্দুশাস্ত্রসমূহের মর্মার্থ বিচারে জানা যায়, সংস্কার দ্বারা ও সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ পরিপূর্ণরূপে সামাজিক মানুষ ও সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। হিন্দু সংস্কারের ভেতর ধর্মীয় বিধান, বহুবিধ ধর্মীয় বিচার, আনুষঙ্গিক নিয়ম ও অনুষ্ঠান নিহিত আছে দেখা যায়। এইসব শুধুমাত্র ঔপচারিক দৈহিক সংস্কার মাত্র নয়, এগুলি সংস্কার্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বারা সংস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তির ভেতরে অবর্ণনীয় গুণের বিকাশ হয়। হিন্দু সংস্কারের মহত্ত সম্পর্কে মহর্ষি মনু বলছেন—

বৈদিকৈঃ কর্মভিঃ
পূর্বোনিষেকাদির্দ্বিজন্মনাম্।
কার্যঃ শরীরসংস্কারঃ পাবনঃ প্রেত্য
চেহ চ।।

গার্ভহৌমৈর্জাতকর্ম-চৌড়-মৌঞ্জী
নিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং
গার্ভিকঞ্চৈনোদ্বিজ্যানামথমৃজ্যতে।।

মহর্ষি অঙ্গিরার মতে—

চিত্রংকর্ম যথানেকৈরঙ্গৈরুন্মীল্যতে
শনৈঃ।
ব্রাহ্মণ্যমসি তদ্বৎ স্যাৎ
সংস্কারৈর্বিধিপূর্বকৈঃ।।

হিন্দু ধর্মে সংস্কার বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলি পালন করলে ও মন্ত্রসমূহের বিশ্লেষণ করলে সেই সকল সংস্কারের দ্বারা যে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হয় বলে ধরা হয় সেগুলির সাধারণত কেমন তার একটি বিবরণ দেওয়া যায়।

১. দেহ ও মনের শুদ্ধি এবং তাকে ব্রহ্মতেজের আধার হিসেবে বোঝা।

২. ব্যক্তির নৈতিক বিকাশ সম্পাদন।

৩. অবাঞ্ছিত প্রভাব দূরীকরণ।

৪. ধনধান্য, পশু, সন্তান, দীর্ঘায়ু, সমৃদ্ধি, শক্তি ও বুদ্ধিলাভ।

৫. অভীষ্ট প্রভাবের আমন্ত্রণ ও প্রাপ্তি।

৬. জীবনে বিভিন্ন কারণে সঞ্জাত সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদের অভিব্যক্তি সৃষ্টি।

৭. গর্ভ ও বীজ সম্বন্ধীয় দোষের দূরীকরণ।

৮. ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশ সম্পাদন।

৯. ব্যক্তির অন্তঃকরণে সামাজিক দায়িত্ববোধের উন্মেষ।

১০. সামাজিক বিশেষাধিকার তথা অপরাপর দায়িত্ব পালনে যোগ্যতা সম্পাদন।

১১. ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পূর্বক ব্রহ্মপদলাভ।

এই সকল সংস্কারগুলি পালিত হলে ব্যক্তির জীবনে নানারকমের উপকার সাধিত হয়। ভগবানের নামগুণ কীর্তন, দেশ ও জাতির বিশেষত ভারতমাতার

সেবা করা এবং তার যোগ্য সন্তানরূপে নিজেকে গড়ে তুলবার জন্যও নানারকম সংস্কারের কথা বলা হয়।

এই সকল পালনীয় সংস্কারের সংখ্যা বিষয়ে গৃহ্যসূত্রগুলির মধ্যে নানারকম পার্থক্য আছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, যথা— পারস্কর গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কার ১৩টি। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত সংস্কারের সংখ্যা ১১টি। বৈখাননাস গৃহ্যসূত্রে ১৮টি। বৌধায়ন সূত্রে বর্ণিত সংস্কার ১৩টি। ধর্মসূত্রগুলির মধ্যেও সংস্কারের সংখ্যায় বৈষম্য আছে। গৌতম ধর্মসূত্রে ৪০টি সংস্কারের উল্লেখ আছে তার মধ্যে আটটি আত্মগুণ।

পরবর্তীকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রমুখ স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রমণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকর্ম, (৯) কেশান্ত, (১০) উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন, (১১) সমাবর্তন, (১২) বিবাহ এবং (১৩) অন্ত্যেষ্টি— এই তেরোটি সংস্কার স্বীকার করেছেন। আরও পরে স্মৃতিনিবন্ধ যুগে কেশান্ত, সমাবর্তন ও অন্ত্যেষ্টি— এই তিন সংস্কার বাদ দিয়ে (১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন, (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) জাতকর্ম, (৫) নামকরণ, (৬) নিষ্ক্রমণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, ও (১০) বিবাহ— এই দশটি সংস্কারের উল্লেখ ও প্রয়োগবিধি বর্ণনা করেছেন নিবন্ধকারগণ। তথাপি ভারতবর্ষের সনাতন সমাজে এখনও গৃহ্যসূত্রযুগের কর্ণবেধ সংস্কার এবং সূত্র ও স্মৃতিযুগের সমাবর্তন সংস্কার উপনয়নকালে শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হয়।

তবে বর্তমান সময়ে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ এই তিনটি সংস্কারই মূলত অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এর মধ্যে আবার বিবাহ সংস্কারেই শাস্ত্রীয় নির্দেশানুগ গুরুত্ব পরিদৃষ্ট হয়। উপনয়ন সংস্কারে ব্রাহ্মণদের মধ্যে আগ্রহ ও গুরুত্ব দেখা গেলেও ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণের মধ্যে তার অস্তিত্ব দেখা যায় না বললেই হয়। সাধারণভাবে মৌর্যযুগ থেকে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণলুপ্তির মূল কারণ, এই সংস্কার বিলুপ্তি। বর্ণানুসারে সংস্কারের বিলুপ্তির ফলেই বর্তমানে হিন্দু সনাতন সমাজে নানারকমের বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

সনাতন হিন্দু সমাজের সংস্কারগুলি সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন। সংস্কারগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) গার্ভ সংস্কার, (২) শৈশব সংস্কার, (৩) কৈশোর সংস্কার, (৪) যৌবন সংস্কার। প্রথম তিনটি (গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন) গার্ভ সংস্কার। দ্বিতীয় তিনটি (জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ) শৈশব সংস্কার। তৃতীয় তিনটি (অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন) কৈশোর সংস্কার এবং চতুর্থ (বিবাহ) সংস্কারটিকে যৌবন সংস্কার বলা হয়।

গর্ভাধান— এটি প্রথম সংস্কার। গর্ভাধান মনুষ্য জীবনের প্রাক্‌জন্ম সংস্কার এবং স্ত্রীর গর্ভসংস্কার। পূর্বমীমাংসা (৭.৪.২.) অনুসারে— গর্ভঃ সংধার্যতে যেন কর্মণা তদ্‌গর্ভাধানমিত্যনুগত্যর্থে কর্মনামধেয়ম্। আচার্য্য শৌনক বলেছেন— যে কর্মের সমাপ্তিতে স্ত্রী স্বামী প্রদত্ত বীর্য ধারণ করে তাকেই গর্ভালম্ভন বা গর্ভাধান বলা হয়।

গর্ভাধানাদি সংস্কারের উদ্দেশ্য সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন করা। সেই মহৎ ও উচ্চ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়েই আর্যশাস্ত্র বেদমূল থেকেই স্থির করলেন যে, জনক-জননীর দেহে যে সকল দোষ থাকে, তাই সন্তানে সংক্রমিত হয়। এই বিষয়টি স্থির সংকল্প হয়েই গর্ভাধান, গর্ভগ্রহণযোগ্যতা এবং তদুপযুক্ত সময় নিরূপণ করে সন্তান উৎপত্তিকালেও যাতে জনক-জননীর মন পশুভাবে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র না হয়ে, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হয়, সেই কারণেই আর্যশাস্ত্রে গর্ভাধানাদির ব্যবস্থা নির্দেশিত হয়েছে। 'ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু'— এই মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, গর্ভাধান সময়ে পতি পত্নীকে বলছেন— ''সর্বব্যাপী বিষ্ণু তোমার গর্ভস্থানকে প্রসবসমর্থ করুন। দেবশিল্পী ত্বষ্টা তোমার রূপ প্রকাশ করুন, যেইমাত্র বীজে গর্ভ হয়, প্রজাপতি তোমার জননেন্দ্রিয়ে সেইমাত্র বীজ প্রক্ষেপ করুন; আদিত্যদেব পুত্রার্থ তোমার গর্ভরক্ষা করুন। হে ভগবতি সিনীবালি! তুমি এই বধূতে গর্ভাধান কর অর্থাৎ এর বন্ধ্যতা দূর কর।

যাঁদের অধিষ্ঠানে সমুৎপন্ন সন্তান সদাসর্বদা দেবগণ দ্বারা অভ্যুদিত, স্বত বিনয়নম্র, সত্ত্বগুণবান্, সম্পদযুক্ত ও আত্মানন্দময় হয়, সেই পদ্মমালাধারী আশ্বিনীকুমারযুগল গর্ভাধান করুন।''

এইরকম আনন্দময়, পবিত্র, উচ্চ, শুভলক্ষণ উদ্দীপক ভাবসমূহের সমাবেশ-সহ সঞ্জাত সন্ততি যে দিব্যভাবযুক্ত ও সকল প্রকার সুলক্ষণে অভিষিক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে সকল ব্যক্তি হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের ও মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করে ভক্তি নম্র চিত্তে তার অনুসরণ ও পালন করেন এবং তাঁদের নিজকুলে গর্ভাধান সংস্কারের পালন করে তাঁরা শুধু তাঁদের নিজ নিজ কুলের মঙ্গল করেন তাই নয়, হিন্দুধর্ম ও পরম পবিত্র ভারতমাতার সেবার জন্য অতি মহৎ কর্ম সম্পাদন করেন। কারণ গর্ভাধান কর্মটি শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক ধর্মীয় কৃত্যমাত্র নয়। একেবারে যথার্থ সংস্কার কর্ম।

পুংসবন— গর্ভাধান সংস্কার যথার্থরূপে সম্পাদিত হওয়ার পর গর্ভধারণ নিশ্চিতরূপে অনুভূত হলে পুংসবন নামক সংস্কারটি পালন করা হয়। সূত্রকারের মতানুসারে গর্ভগত সন্তানের স্পন্দন অনুভূত হলে দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসের গর্ভকালে এই সংস্কার পালন করতে হয়। এই সংস্কার গর্ভরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গর্ভ গ্রহণের দিন থেকে চারমাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হবার অনেক সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে তৃতীয়মাসের দশদিনের মধ্যেই পুংসবন সংস্কার পালন কর্তব্য। পুংসবন শব্দ অর্থে পুত্র সন্তানের উৎপত্তি। সাধারণত বেশিরভাগ স্ত্রীলোকই অধিক পরিমাণে পুত্রসন্তান কামনা করেন। এই কারণেই পুংসবন সংস্কারের অনুষ্ঠান পালিত হয়।

এই সংস্কারে যে সকল মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর হৃদয়

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে; সেই আনন্দের গভীরতায় গর্ভাবস্থায় আলস্য, ভয়, বমনাদিজনিত অবসাদ প্রভৃতি দূর হয়ে গর্ভপোষণের শক্তি যেন আরও অধিকমাত্রায় সঞ্চারিত হয়। এই মন্ত্রে উচ্চারিত হয়, যথা— মিত্রাবরুণ দেবদ্বয় পুরুষ, অশ্বিনীকুমারযুগল পুরুষ, অগ্নি ও বায়ু, এঁরাও পুরুষ, তোমার গর্ভে পুরুষেরই আবির্ভাব হয়েছে। পতি যখন এই রকমের মন্ত্র পাঠ করতে থাকে, তখন তা শুনে গর্ভিণীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এই আনন্দের শক্তিতে যে উৎকৃষ্ট ফল দেয় তা প্রমাণিত। এছাড়া পুংসবন সংস্কারে দুই ফলযুক্ত বটশুঙ্গা মাষকলাই ও যবের সঙ্গে গর্ভিণীর নাসিকা পথে ঘ্রাণ নেবার বা নাসাপথে এর রস নিক্ষেপের ব্যবস্থা আছে। মনে করা হয় এই সকল দ্রব্যে গর্ভ রক্ষার বিশেষ শক্তি আছে। আয়ুর্বেদ অনুসারে জানা যায় বটফল দ্বারা যোনিদোষ বিনষ্ট হয়।

সীমন্তোন্নয়ন— এই সংস্কারে গর্ভিণীর সীমন্ত উন্নয়ন বা উত্তোলন করা হয়। প্রথম গর্ভের চতুর্থ বা ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে এই সংস্কারটি করতে হয়। এই সংস্কারের ফলে স্ত্রীর আনন্দ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায় এবং ভ্রূণাকারে জাত গর্ভস্থ শিশুর দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি ঘটে। স্মার্তমতে পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন শুধুমাত্র প্রথমবার গর্ভকালেই কর্তব্য। দ্বিতীয়বারে আর করা হয় না। সীমন্ত উন্নয়ন করার পর গর্ভিণী স্ত্রী আর শৃঙ্গারবেশে অলঙ্কৃতা বা পতিগামিনী হবেন না। এই সংস্কারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ও চরুপাকাদি সম্পাদনপূর্বক স্বামী একবৃন্তস্থ পরিপক্ক যজ্ঞডুম্বরজোড়া ও আরও কিছু মঙ্গলদ্রব্য গর্ভিণীর গলায় পট্টসূত্রসহকারে পরিয়ে দেবেন ও এক মন্ত্র বলবেন। যথা— প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ স্ত্রী দেবতা ঔডুম্বরফলযুগলবন্ধনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনীভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ।। (‘হে কল্যাণী! তুমি ফলশালী উড়ুম্বর তরু হইতেও ফলসমন্বিতা হও। হে বনস্পতে! যে রূপ পর্ণের পর পর্ণের উৎপত্তি হয়ে সমৃদ্ধি জন্মলাভ করে, সেইরূপ এই বধূতে পুত্ররূপ মহাধন সঞ্জাত হোক।’)

জাতকর্ম— সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণে (নাভিচ্ছেদের পূর্বে) যে সংস্কার পালন করা হয় তার নাম জাতকর্ম। এই সংস্কার অনুসারে পিতা প্রথমত, যব ও ব্রীহিচূর্ণ দ্বারা, পরে স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট মধু ও ঘৃত গ্রহণ করে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা সদ্যোজাত সন্তানের জিহ্বা স্পর্শ করেন। মন্ত্রানুসারে— ‘পুত্রে জাতে সতি পিতা ‘মা নাভিং কৃন্তত স্তন্যঞ্চ মা দত্ত ইত্যভিধায় কৃত স্নানঃ কৃতবৃদ্ধি শ্রাদ্ধঃ প্রক্ষালিত শিলায়াং ব্রহ্মচারিণা কুমার্য্যা গর্ভবত্যা বা শ্রুতস্বাধ্যায়শীলেন ব্রাহ্মণেন বা অনাবৃত্তলোষ্ট্রেণ পিষ্টৌব্রীহিযবৌ দক্ষিণহস্তা— নাকিঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা প্রজাপতির্ঋষিরন্নং দেবতা ব্রীহি— যবচূর্ণেন কুমারস্য জিহ্বামার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইয়মাজ্ঞে দমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতচং’।।

ব্রীহিযবচূর্ণ পুত্রের জিহ্বায় দিয়ে পিতা বলবেন— ‘এই অন্নই প্রজ্ঞা, ইনিই আয়ু, ইনিই অমৃত; তোমার ওই সকল লাভ হোক। এরপর স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট ঘৃত নিয়ে পুত্রের জিহ্বায় দিয়ে বলবেন, ‘মিত্র বরুণ দেবতাযুগল তোমাকে মেধা প্রদান করুন; অগ্নি তোমাকে মেধা প্রদান করুন এবং পদ্মমাল্যধারী অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমাকে মেধা দান করুন। পুনরায় স্বর্ণ দ্বারা ঘৃষ্ট ঘৃত নিয়ে পুত্রের জিহ্বায় স্পর্শ করিয়ে বলবেন— ইন্দ্রের প্রিয়পাত্র বৃহস্পতির কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমাকে মেধা সমর্পণ করুন। এরপর পিতা বলবেন— ‘নাভিচ্ছেদন কর, স্তন্য দাও’ এই বলে পিতা আবার স্নান করে নেবেন।

নিষ্ক্রমণ— জাত সন্তানের জন্মদিন হতে তৃতীয় শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে প্রাতে কুমারকে স্নান করিয়ে সন্ধ্যের পর পশ্চিমদিকে মুখ করে জননী কুমারকে পিতার হাতে দেবেন। মাতা পতির পেছনে উত্তরদিকে চন্দ্রাভিমুখী হয়ে স্বামীর দক্ষিণ দিকে অবস্থান করবেন। পিতা মন্ত্রে বলবেন ‘হে চন্দ্র, তোমার অতিশীতল আলোকে আলোকিত এবং সন্তানের অন্তর্মধ্যে আত্মার স্থান ও সেই ব্রহ্মকে আমি অবগত আছি। আমি যেন পুত্র সম্বন্ধীয় কোনো অর্ঘ না পাই। পৃথিবীর অমৃত ও দ্যুলোক চন্দ্রমধ্যে অবস্থিত, আমি যেন পুত্র থেকে কোনো ব্যসন প্রাপ্ত না হই। হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! আপনারা উভয়ে আমার সন্তানের কল্যাণ বিধান করুন। আপনারা লোকপাল। আমার কুমার যেন জননী-সহ অবস্থিত থেকে কোনো প্রকার বিপদাপন্ন না হয়।’ এই মন্ত্রগুলি পাঠ করে কুমারকে চন্দ্র দেখাতে হয়। এরপর পিতা চন্দ্রদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করবেন। ‘হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! হে অত্রিনেত্রোদ্ভব! হে শশাঙ্ক! আপনি রোহিণী-সহ আমার এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।’

নামকরণ— ভূমিষ্ঠ সন্তানের দশরাত্রি বা শতরাত্রি কিংবা সম্বৎসর পূর্ণ হলে নামকরণ সংস্কার করার ব্যবস্থা আছে। নামকরণের ক্ষেত্রে কুমারের জন্মতিথি দেবতা, হোম ও জন্মনক্ষত্র দেবতার উদ্দেশে হোম করা হয়। মন্ত্র পাঠ করে কুমারের নাম সম্বোধন করে অমুকদেবশর্ম্মন বলে প্রয়োগ করতে হয়। পিতা কুমারের মাতার বামকর্ণে ‘শ্রীঅমুক দেবশর্মা তোমার পুত্র’ এই কথা বলে কুমারের দক্ষিণ কানে ‘তুমি অমুক দেবশর্ম্মা’ এই কথা বলবেন। নামকরণের উপযোগিতা ও মহত্ত সম্পর্কে বৃহস্পতি বলেছেন— নামাখিলস্য ব্যবহারহেতুঃ শুভাবহঃ কর্মসুভাগ্যহেতুঃ। নাম্নৈব কীর্তিং লভ্যতে মনুষ্যস্ততঃ প্রশস্তংখলু নামকর্ম।। অর্থাৎ নাম সমস্ত রকম ব্যবহারের হেতু শুভাবহ এবং কর্মসমূহে ভাগ্যের কারণ। নামের দ্বারাই মানুষ কীর্তিলাভ করে।

অন্নপ্রাশন— অন্নপ্রাশনের কাল পুত্রের ষষ্ঠ ও অষ্টম মাস এবং কন্যার পঞ্চম ও সপ্তম মাস। এই সংস্কার মাধ্যমে শিশুর খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ এই সংস্কার দ্বারা শিশুর সংকরীকরণ দোষের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। খাদ্যাখাদ্যবিচার রাহিত্যই সংকরীদোষের প্রধান হেতু। শাস্ত্রানুসারে পিতা শিশুকে অন্ন খাওয়াবে। তবে রীতি প্রচলিত যে মাতুল অন্ন খাওয়াবে। পিতা প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ তুষ্ণীভাবে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে মহাব্যাহৃতি হোম করবেন। মন্ত্রে বলা

হয়েছে, 'অন্নই এক আচ্ছাদক অর্থাৎ রক্ষক। অন্নই অখিল ভূতকে রক্ষা করে। যা অন্নযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যসমন্বিত ব্যক্তিরাই শ্রী; সূর্যদেব অন্নদ্বারা আধিপত্য অর্পণ করুন।। ২।। সকল অন্নরসের শ্রেষ্ঠ ঘৃত এবং তিনিই তেজ ও সম্পৎ, তার ইচ্ছেতেই আমি হোম করছি। অন্নপতি সূর্য আরোগ্যপ্রদ ও অগ্নিবর্ধক অন্নবল সমর্পণ করুন এবং অন্নদাতাকে পরিত্রাণ করুন। আমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণ করুন।' এই মন্ত্র পাঠ করে কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করতে হয়।

চূড়াকরণ— চূড়াকরণের মুখ্যকাল এক বছর বা তৃতীয় বছর। কিন্তু পাঁচবছর প্রভৃতি অন্যান্য অযুগ্মবর্ষেও নিষ্পাদিত হয়। এই সংস্কার দ্বারা অপাত্রীকরণ দোষের বিদূরণ হয়। কেশমুণ্ডনই এর প্রধান কাজ। গর্ভাবস্থায় সন্তানের মস্তকে যে কেশ উৎপন্ন হয়। তা নিঃশেষে উন্মুলিত করে, শিশুকে শিক্ষা ও সংস্কারের পাত্রীভূত করা হয়। চূড়াকরণের ফলে সন্তানের শরীরে আনন্দ, ক্ষিপ্রতা, সৌন্দর্য ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। এই সময়েই কর্ণবেধও করণীয় কৃত্য।

উপনয়ন— হিন্দু সমাজে উপনয়ন সংস্কারটি মূলত মানুষের বিদ্যারম্ভমূলক অনুষ্ঠান। স্মৃতি শাস্ত্র অনুসারে উপনয়ন অর্থে, আচার্যস্য উপনয়নমিতি উপনয়নম্। উপনয়নে সন্তানের সাংস্কৃতিক তথা বৌদ্ধিক বা মানসিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা আছে। আবার সামাজিক উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির বিষয়ও যুক্ত আছে।

যখন ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ ছিল তখন তিন বর্ণেরই উপনয়নকাল সুনির্ধারিত ছিল। যথা— ব্রাহ্মণদের অষ্টম বর্ষ থেকে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়দের একাদশ বর্ষ হতে দ্বাবিংশ বর্ষ পর্যন্ত এবং বৈশ্যদের দ্বাদশ বর্ষ হতে চতুর্বিংশ বর্ষ পর্যন্ত। শূদ্রদেরও উপনয়নের বিধি আছে। মহর্ষি মনুর মতে (মনু ২,৩৬-৪০) পূর্বনির্দিষ্ট বছরের মধ্যে উপনয়ন না হলে সাবিত্রী পতিতরূপ অপরাধ হয়। তখন পতিত সাবিত্রী সন্তানদের উপনয়ন দিতে হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাতেও উপনয়ন না হলে তাকে আর্যধর্মের বহির্ভূত বলে গণ্য করা হয়। তার আহার ব্যবহার ত্যাগ করা হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে উক্ত আছে, তাকে কোনো ব্যক্তি কন্যাও দান করিবে না।

ভারতের হিন্দু সংস্কৃতিতে উপনয়নের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বোধন ঘটে। যজ্ঞোপবীত সূত্র ধারণ করার মাধ্যমে সর্বদা সন্তানকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, তুমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ বরণ করে জন্মেছ। এগুলি থেকে মুক্ত হবার জন্য তুমি নিরন্তর পঞ্চযজ্ঞাদি কৃত্যগুলি অবশ্যপালনীয় কর্তব্যরূপে সম্পাদন করবে।

অনেক ক্ষেত্রে বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উপনয়নের সঙ্গেই সমাবর্তন ও ত্রিরাত্রপালন প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি করা হয়। চূড়াকরণ কর্ণবেধ ও উপনয়নের সঙ্গেই করা হয় অনেক সময়।

বিবাহ— দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মহত্ত্বপূর্ণ সংস্কার হচ্ছে বিবাহ। বিবাহকে একটি যজ্ঞ বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি বিবাহ করে গার্হস্থ্য কর্মে প্রবেশ করেনি, সে অযজ্ঞীয় বা যজ্ঞহীন হিসেবে নিন্দিত হয়। বিবাহে শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিধির মিলন ঘটে থাকে। বর-বধূর মাঙ্গল্যসূত্র ধারণ, মালাবদল, গ্রন্থিবন্ধন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলির উল্লেখ গৃহ্যসূত্রে নেই কিন্তু এই সকল বিষয় লৌকিক রীতি হতেই বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রবেশ করেছে।

(বিবাহ সংস্কার সম্পর্কে একটি পৃথক প্রবন্ধে পরবর্তীকালে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।)

ভারতবর্ষের হিন্দু সনাতন ধর্মে মানব সমাজকে সভ্য, সুশৃঙ্খল, বিকশিত ও যথাযথ রূপে গড়ে তুলতে সেই প্রাচীনকাল থেকে নানা রীতি-নীতি, বিধিবিধান ও সামাজিক অনুশাসন তৈরি হয়েছে। এই সকল অনুশাসন অনুসরণ করেই ভারতীয় সংস্কৃতি পরিপুষ্ট হয়েছে। ভারতবাসী তাঁদের ব্যক্তিজীবন, পরিবারজীবন ও সমাজজীবন বিকশিত ও সমুন্নত করে তুলেছেন। এই সকল সংস্কার ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষের মানুষের জীবন আরও সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্যেই প্রজ্ঞাবান ভারতীয় ঋষিরা বৈদিক কাল থেকে সন্তানের প্রাক্‌জন্ম মুহূর্ত থেকে সমগ্র জীবনব্যাপী নানারকম সংস্কারের বিধান দিয়েছেন। এগুলির পালনে শৈথিল্য এলেই সমাজে ও ব্যক্তিজীবন ও পরিবারে জীবনে নানারকমের বৈপরীত্য আসে এবং সুষ্ঠ জীবনযাত্রা পদে পদে ব্যাহত হয়।

যথাযথ হিন্দু সংস্কার না পেলে, সেই মানুষ হিন্দু সমাজ, হিন্দুধর্ম ও হিন্দু রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো কাজেই আসেন না শুধু নয়, হিন্দুত্বের মর্মই বুঝতে পারেন না এবং পদে পদে তার বিরোধিতা করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলেন। ভারতবর্ষের প্রজ্ঞাবান মুনি ঋষিরা যে পথ দেখিয়ে গেছেন, তাঁদের দেখানো পথেই ভারতমাতার গৌরববরবি সমগ্র জগদ্‌বাসীকে উদ্ভাসিত ও চমৎকৃত করেছে। ভারতের সংস্কৃতি ও ভারতমাতাকে রক্ষা করার দায়িত্ব সমগ্র হিন্দু সমাজের। সকলরকম বর্ণভিত্তিক সংস্কার পালনের মধ্যে দিয়েই ভারতীয় সমাজ আরও সুগঠিত, সুন্দর ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

*** বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

এই বিল এমন এক নীতির স্বীকৃতি, যা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সভ্যতার আদর্শকে পথ দেখিয়ে এসেছে; সেই আদর্শ-নারীর অগ্রগতিতেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়।

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের আঁকা নারী প্রগতির বৃত্তটি সম্পূর্ণ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

সৌমিত্র সেন

রাজা রামমোহন রায় সর্বপ্রথম এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারী জাতির জন্য এগিয়ে আসেন। সমাজের তথাকথিত বিভিন্ন নিয়ম নীতির বিরুদ্ধে তিনি সমালোচনা করেন এবং ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার (Women's Education in India) প্রভূত বিস্তার সাধন করেন।

বিদ্যাসাগর (১৮৫৫) গভীর ক্ষোভে বলেছিলেন, 'যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।' তিনি আর্তনাদ করেছিলেন, 'হা অবলাগণ! তোমরা কী পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!'

মধ্যযুগে পারিপার্শ্বিক কারণে ভারতে নারী গৃহবন্দি ছিল। তাই এখানেই প্রথম দেখা দেন নারীত্রাতারা— রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রামমোহন বিধবা নারীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবার্ত্তকের প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ করেন ১৮১৭-তে। দ্বিতীয় প্রস্তাব ১৮১৯-এ; এ-বিষয়ে তার শেষ লেখা 'সহমরণ' বেরোয় ১৮২৯-এ। বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক— প্রথম প্রস্তাব প্রকাশ করেন। ১৮৫৫-তে এবং একই বছর প্রকাশ করেন দ্বিতীয় প্রস্তাব। পৃথিবীর আর কোথাও তাদের, অন্তত রামমোহনের, আগে নারীর পক্ষে কোনো পুরুষ কিছু লেখেনি, লড়াইয়ে নামেনি। বিলেতে নারীর পক্ষে প্রথম যে-পুরুষ বই লেখেন, তিনি দার্শনিক উইলিয়াম টমসন। তাঁর বই আর তিনি হন উপহাসের পাত্র। পশ্চিমে নারীর পক্ষে পুরুষের লেখা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বই জন স্টুয়ার্ট মিলের 'নারী-অধীনতা' বেরোয় ১৮৬৯-এ। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর পৃথিবীর দুই আদি নারীবাদী পুরুষ, মহাপুরুষ। তাঁরা কর্মবীর হিসেবেও অসামান্য; তাঁরা বই লিখেই থেমে যাননি, যাওয়ার উপায় ছিল না; তারা আইন প্রণয়ন করিয়ে বাস্তবায়িত করেছিলেন নিজেদের স্বপ্ন। পৃথিবীর নারীবাদের ইতিহাসে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের নাম স্বর্ণলিপিতে লেখা থাকার কথা।

১৮৭৮ সালে প্রথম বিদেশ যাত্রায় বিলিতি সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর নারীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে পরে অনেক রচনা নাড়া দিয়েছিল সমাজকে। 'স্ত্রীর পত্র', 'বোষ্টমী' কিংবা 'হৈমন্তী' গল্পগুলি তখনকার বঙ্গের গতানুগতিক সমাজচেতনার মূলে এক ধরনের কুঠারাঘাত ছিল। অন্য দিকে 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা প্রচলিত সমাজজীবনের জীর্ণ পুরনো সংস্কারকে উপেক্ষা করার একটা পথনির্দেশ পাই। কবির কথায় নারীর স্বভাবের মধ্যে রয়েছে সংসারকে শান্তি ও আনন্দ দেবার এক সহজাত প্রবৃত্তি। তাঁদের স্বভাবের এই রূপটিকে শিক্ষার দ্বারা উদ্ভাসিত করা, সমাজের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তিনি চেয়েছিলেন, '... তাঁদের রক্ষণশীল মন থেকে তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়।'

ভারতে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে শিল্পোদ্যোগ, খেলাধুলো থেকে সশস্ত্র বাহিনী, কিংবা সঙ্গীত ও শিল্পকলা, প্রতিটি

ফঃ ৫

ক্ষেত্রেই মহিলারা সামনের সারিতে রয়েছেন। তাই শিক্ষায় সুযোগ বাড়িয়ে, স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন করে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং মৌলিক সুযোগসুবিধাগুলি আরও বেশি করে তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু, বিশ্ব রাজনীতি অথবা বিভিন্ন সংসদীয় প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি যথাযথ নয়। প্রশাসনিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনাচিন্তাকে কাজে লাগাতে পারেন না। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। অথচ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে মহিলাদের যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করতে আগের সরকারগুলি একাধিক কমিটি তৈরি করে বিলের খসড়া উপস্থাপিত করলেও কোনোটাই বাস্তবায়িত হয়নি। তবে ২০২৩-এর সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সংসদে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' পাশ করা হয়। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মহিলাদের সংরক্ষণের এই সুযোগটি সংবিধানের মূল ভাবনার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত। সংবিধান প্রণেতারা এমন এক সমাজের কথা ভেবেছিলেন, যেখানে সাম্য সুনিশ্চিত হয়। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণকে আরও শক্তিশালী করা, তাঁদের এই স্বপ্ন পূরণের দিকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগকে আর বিলম্বিত করে মহিলাদের অংশগ্রহণকে কার্যকর করতে দেরি করলে আমাদের গণতন্ত্রের সমান অধিকারের চিন্তাকে পিছিয়ে দেবে। ইতিমধ্যেই সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়টিতে আলোচনার মাধ্যমে সকলেই একমত হয়েছেন। মনে রাখতে হবে, আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের চাহিদাও এখানে রয়েছে। তাঁদের এই দীর্ঘদিনের চাহিদাকে স্বীকৃতি দিলে দেশের উন্নয়নের গতি সুস্থায়ী হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাক দিয়েছেন—'আসুন, আমরা নারীশক্তির ক্ষমতায়ন করি।'

গত ১৬ এপ্রিল সংসদে বিশেষ অধিবেশনে 'নারী সংরক্ষণ বিল' উত্থাপিত হয়েছে। এই বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখছেন যে নারী সংরক্ষণ বিলের ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিল। প্রধানমন্ত্রী মোদীজী তাঁর নিবন্ধে স্বীকার করেছেন, দশকের পর দশক ধরে আগের সরকারগুলো বারবার এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে; কমিটি গঠন করা হয়েছে, বিলের খসড়া তৈরি হয়েছে; কিন্তু কার্যকর পরিণতি কখনো আসেনি।

সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম' (Constitution's 106th Amendment Act) পাশ হয়; যা লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিধান করে।

গত ১৬ এপ্রিল থেকে তিন দিনের একটি বিশেষ সংসদ অধিবেশন ডাকে কেন্দ্র; এবং সেই অধিবেশনের একমাত্র আইনি লক্ষ্য ছিল নারী সংরক্ষণ বিল সংশোধন করে ২০২৯ সালের নির্বাচনের আগেই তা কার্যকর করা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আইনসভায় মহিলাদের সংরক্ষণ এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরি এবং এতে কোনো দেরি হলে তা হবে 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক'।

তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচন এবং বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে যেন নারী সংরক্ষণ কার্যকর অবস্থায় থাকে, সেটি নিশ্চিত করা এখন সরকারের অগ্রাধিকার। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মঞ্জ আইন পাশ হয়েছে, কিন্তু কার্যকর হয়নি। গত ১৭ এপ্রিল নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম আইনের সংশোধনী আসন সংরক্ষণ বিল পাশ হয়নি সংসদের দুই কক্ষে। এই বিলে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়।

প্রথমত, লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমান ৫৪৩ থেকে বাড়িয়ে ৮১৬ করা হবে, যার মধ্যে ২৭৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে ; মোট আসনের প্রায় ৩৩ শতাংশ। দ্বিতীয়ত, ২০২৭ সালের জনগণনার পরিবর্তে ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিভাজন করা হবে, যাতে ২০২৯ সালের নির্বাচনের আগেই এই সংরক্ষণ কার্যকর করা সম্ভব হয়। New Indian Express-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজ্যের বিধানসভাগুলোতেও একই অনুপাতে মহিলা আসন সংরক্ষণ করা হবে। এই সংশোধিত আইন ২০২৯ সালের ৩১ মার্চ থেকে কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

মোদীজীর নিবন্ধে বার্তা: 'সমাজ তখনই এগোয় যখন নারী এগোয়'।

গত ৯ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী মোদীজী বলেছেন, ''ভারতের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মহিলা এবং জাতির উন্নয়নে তাঁদের অবদান অপরিসীম ও অমূল্য।'' তিনি আরও বলেন, 'আইনসভায় মহিলাদের সংরক্ষণ কোটি কোটি ভারতীয় নারীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং এই মূলনীতিরই স্বীকৃতি যে সমাজ তখনই এগিয়ে যায়, যখন নারী এগিয়ে যায়।' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, উদ্যোগ, ক্রীড়া, সশস্ত্র বাহিনী, সঙ্গীত ও শিল্পকলা; সব ক্ষেত্রেই নারীদের অগ্রণী ভূ মিকার উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'যখন মহিলারা প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন, তখন তাঁরা এমন অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আসেন যা সরকারি আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে এবং শাসনের মান উন্নত করে।' এই বিল এমন এক নীতির স্বীকৃতি, যা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সভ্যতার আদর্শকে পথ দেখিয়ে এসেছে; সেই আদর্শ-নারীর অগ্রগতিতেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। গত ১৭ এপ্রিল লোকসভায় ভোটাভুটিতে বিলটির পক্ষে ২৯৮টি এবং বিপক্ষে ২৩০টি ভোট পড়ে। বিলটি পাশ করাতে প্রয়োজন ছিল বিশেষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, যার অভাবে বিলটি সংসদে পাশ করানো সম্ভব হয়নি। আসুন, আমরা ভারতের আপামর জনসাধারণ গ্রামে গঞ্জে, শহর থেকে শহরতলীতে নারী মুক্তির সোপান হিসেবে এই মহিলা সংরক্ষণ বিলের সমর্থনে একে অন্যকে জাগরিত করি। □

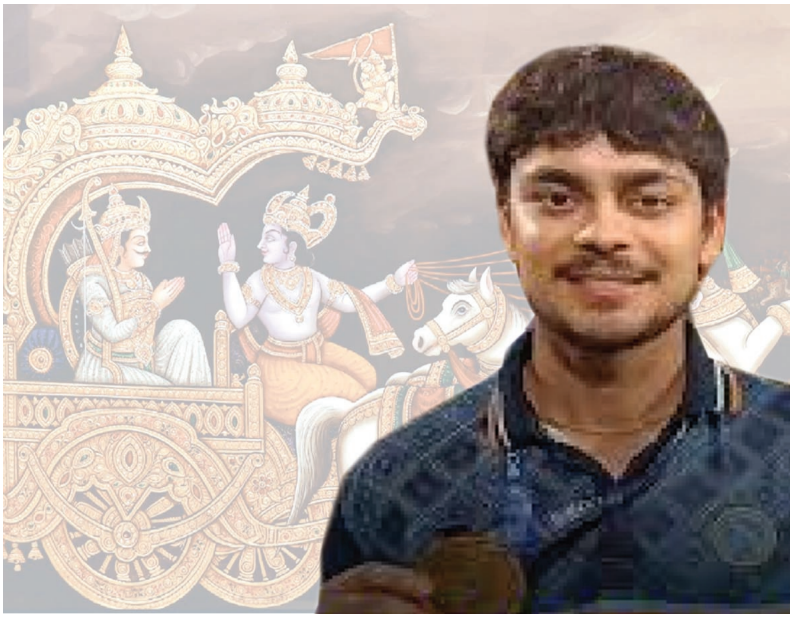

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ই ক্রিকেটার ঈশান কিষাণের প্রেরণা

প্রদীপ মারিক

ক্রিকেটার ঈশান কিষাণকে আবার ক্রিকেটে ফিরিয়ে আনলো শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। ক্রিকেট খেলতে খেলতে হঠাৎ ক্রিকেট মাঠ ছেড়ে 'নিখোঁজ' হয়ে যান ঈশান। বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। ঝাড়খণ্ড ক্রিকেট সংস্থার কর্তাদেরও অন্ধকারে রেখেছিলেন। অথচ দুবাইয়ে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে স্বমেজাজে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সে সময় ঘরোয়া ক্রিকেট থেকেও নিজেকে সরিয়ে নেন ঈশান। বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ বোর্ড কর্তারা তাঁকে ছেঁটে ফেলেন সব দল থেকে। কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকেও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

নিরুদ্দেশ ঈশানকে ২২ গজে ফিরিয়ে ছিলেন হার্দিক পাণ্ড্যা। বড়োদরায় হার্দিক এবং ক্রুণাল পাণ্ড্যার সঙ্গে অনুশীলন, ফিটনেস ট্রেনিং শুরু করেন। তবু বোর্ড এবং রাজ্য সংস্থার কর্তারা মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। 'অবাধ্য' ঈশানকে দলে ঠাঁই দিতে রাজি ছিলেন না কেউ। ২০২৪ সালের আইপিএলে আবার ঈশান ফেরেন প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে। দারুণ কিছু করতে পারেননি সে বার। ভারতীয় দলে ফেরার দরজা তখনও বন্ধ রেখেছিলেন বোর্ড কর্তারা। পথ কঠিন বুঝে যান ঈশান।

তিনি অপেক্ষা করেছেন। অনুশীলন করেছেন। নতুন করে ক্রিকেটের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ফিরে আসার এই পথের প্রদর্শক ছিলেন হার্দিক। কিছুটা শুভমান গিলও। প্রিয় বন্ধুকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করতে শুরু করেন। তবু জাতীয় দলের নির্বাচনী বৈঠকে তাঁর নাম উচ্চারণই করতেন না অজিত আগরকরেরা।

ঈশান হাল ছাড়েননি। ভরসা রেখেছিলেন নিজের ক্রিকেটীয় দক্ষতায়। নানা কারণে সমস্যায় জর্জরিত ঈশান শান্তি খুঁজতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বেছে নেন। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে মোবাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্লোক চোখে পড়ে, যেখানে লেখা ছিল, 'কর্ম করো, ফলের আশা করো না'। বাবা প্রণব পাণ্ড্যাকে এই শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। বাবা অর্থ বোঝানোর পাশাপাশি আরও কিছু শ্লোক বলেন। তার পর থেকেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ঈশানের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যাট, উইকেট রক্ষার দস্তানার সঙ্গে এই বইও তাঁর কিটব্যাগে থাকবেই।

গীতায় জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ, বলতে গেলে সবকটা অধ্যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম ভক্ত অর্জুনকে বলে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণীকুলকে বলেছেন। ব্যক্তিকে কর্মের গুরুত্ব বোঝায় গীতা। এমনকী শ্রেষ্ঠ মানব জীবনের সার রয়েছে গীতার মধ্যে। এতে ১৮টি অধ্যায় রয়েছে, যাতে জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, একমাত্র সময়ই ঠিক করে দেয় মানুষের জীবনে সুখ আসবে না দুঃখ। জীবন কেমন কাটবে, সেই সংকেত মানুষ তার কার্য থেকেই বুঝতে পারবেন। এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। পশুপাখির থেকেও সেই সংকেত অনেক সময় পাওয়া যায়। কিন্তু অজ্ঞতার কারণে সেই সংকেতগুলো বোঝা হয়তো সম্ভব হয়নি। 'গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিসৃতা।।' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী স্বয়ং পরম পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী, তাই এই গ্রন্থ পাঠ করলে আর অন্য কোনো বৈদিক সাহিত্য পড়বার দরকার হয় না। গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে ভগবদ্গীতা শ্রবণও কীর্তন করলে আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির স্বাভাবিক বিকাশ হয়। বর্তমান জগতে মানুষের নানা রকম কাজে এতই ব্যস্ত থাকে যে, তাদের পক্ষে সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পাঠ করা সম্ভব নয়। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য পড়বার প্রয়োজনও নেই। এই একটি গ্রন্থ ভগবদ্গীতা পাঠ করলেই মানুষ সমস্ত

বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারবে, কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে বেদের সার এবং এই গীতা স্বয়ং ভগবানের মুখনিঃসৃত উপদেশ বাণী। মানুষ নিজের নিজের ধর্মকে অনুসরণ করে, পৌরাণিক তাৎপর্যগুলি তাদের হৃদয়ে একটি অতি বিশেষ স্থান দখল করে থাকে। হিন্দু ধর্মেরও কিছু পৌরাণিক সাহিত্য রয়েছে যেগুলি শিক্ষা ও প্রচারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষ স্থানীয়গুলির মধ্যে হিন্দুরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এই শ্রদ্ধা ও ন্যায়নীতির শিক্ষার জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রবণ ও পঠনের প্রয়োজনীয়তা বেশি হয়ে পড়েছে।

ভারতবর্ষ ঋষি মুনির দেশ। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত 'বৈজ্ঞানিক সত্যের আধার', মূল্যবোধের আকর হিসেবেও সেই প্রাচীন সাহিত্যেই এ দেশের অঙ্গ। দেশকে 'সাংস্কৃতিক দূষণ' থেকে মুক্ত করতে এবং পরবর্তী প্রজন্মকে নীতিশিক্ষা দিয়ে তাদের মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করতে রামায়ণ-মহাভারত-গীতা অবশ্যই গ্রহণীয়। ভগবদ্গীতার অর্থ হলো ঈশ্বরের গান এবং শ্রীমদ্ হলো এর বিশেষণ। ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাতশত শ্লোকের একটি গ্রন্থ। তাই একে সপ্তশতী বলা হয়। এটি সংস্কৃত মহাকাব্য মহাভারতের অংশ। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশেষ মাহাত্ম্য স্বীকৃত। কথিত, যে গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি পুণ্য ফল লাভ করে ও তাঁদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী প্রতিদিন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ করলে ব্যক্তি সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। বর্তমান সময়ে প্রতিটি মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ। ভগবদ্গীতার আসল উদ্দেশ্য মনুষ্য সমাজকে সেই অন্ধকার থেকে মুক্ত করা। প্রতিটি মানুষই নানা কারণে দুঃখ ভোগ করছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার জন্য আমরা বুঝতেই পারি না কেন আমরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এতে জীবনের সার নিহিত রয়েছে। আবার দ্বাপর যুগে কৃষ্ণের সমস্ত লীলার বর্ণনাও পাওয়া যায় গীতায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে জীবনের প্রেরণা করে ঝাড়খণ্ডে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ঈশান বলেছিলেন, 'ভালো পারফর্ম করার পরও ভারতীয় দলে নির্বাচিত হইনি। তখন খারাপ লেগেছিল। নিজেকে বুঝিয়ে ছিলাম, এমন পারফর্ম করেও যদি সুযোগ না পাই, তা হলে আমাকে আরও ভালো কিছু করে দেখাতে হবে। দলকে জেতানোর মতো পারফরম্যান্স করতে হবে। আমাদের দল হিসেবে আরও ভালো কিছু করতে হবে। আমরা অনেক সময় অনেক কিছু আশা করি। দলে নিজের নাম না দেখলে একটু তো খারাপ লাগেই। কিন্তু মানসিক ভাবে আমি এখন অনেক শক্ত। কোনও প্রত্যাশা নিয়ে খেলি না। শুধু নিজের কাজটা ভাল ভাবে করার চেষ্টা করি।'

তিনি শুধু নিজের কাজই করে গিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচের পর ম্যাচ পারফর্ম করেছেন। ভালো, আরও ভালো খেলার চেষ্টা করেছেন। আগরকরদের ভাবতে বাধ্য করেছেন। ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীরকেও আপত্তি করার সুযোগ দেননি। ভারতীয় দলের বন্ধ দরজাটা খুলে ফেলেছেন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে শতরান করে। এক বিশ্বকাপের পর হারিয়ে যাওয়া ঈশান সরাসরি ঢুকে পড়েছেন আর এক বিশ্বকাপের দলে। ঈশান বুঝিয়ে দিলেন শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীই মানব জীবনের একমাত্র প্রেরণা। □

With Best Compliments from-

A
Well Wisher

বাংলাদেশে নৈরাজ্যের নতুন সংস্করণ

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

বাংলাদেশের নতুন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের মানুষ এক ধরনের স্বস্তি ও স্থিতিশীলতার প্রত্যাশা করেছিল। দেশটির মানুষ ভেবেছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক অস্থিরতার পর একটি ভারসাম্যপূর্ণ প্রশাসনিক কাঠামো হয়তো গড়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবতা আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক চিত্র তুলে ধরছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সরকারের মধ্যে স্বনির্ভর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির মারাত্মক ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং পরনির্ভরতা, জোটনির্ভর সমীকরণ ও অদৃশ্য প্রভাবশক্তির উপস্থিতি প্রশাসন পরিচালনায় ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, তারেক রহমানের প্রভাবাধীন ক্ষমতার কাঠামো আদর্শগতভাবে আপোশ করে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'-র মতো শক্তির সঙ্গে সমঝোতায় পথে এগোচ্ছে। সংবিধান সংশোধনের আলোচনার আড়ালে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তিকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা— এমন আশঙ্কা বিশ্লেষকদের একাংশ তুলে ধরছেন। ফলে দেশের মৌলিক চরিত্র নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠছে।

একই সঙ্গে তথাকথিত 'জুলাই আন্দোলন'-কে বিপ্লব হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং সেটিকে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতা উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে । ইতিহাস বলছে, যখন কোনো আন্দোলনকে পরিকল্পিতভাবে বিপ্লবের রূপ দেওয়া হয়, তখন তার পরিণতি প্রায়শই সহিংসতা, প্রতিশোধ ও রক্তপাতেই গিয়ে ঠেকে। বর্তমান পরিস্থিতিতেও তাই হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হত্যা, অপহরণ, চাঁদাবাজি ও লুণ্ঠনের অভিযোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সংখ্যালঘু সমাজের উপর চাপ সৃষ্টি, ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং ধর্মান্তরনের অভিযোগও সামনে আসছে। এসব চিত্র আইনশৃঙ্খলার অবনতির দিকেই ইঙ্গিত করে। এই পরিস্থিতি শুধু নিরাপত্তাহীনতাই বাড়াচ্ছে না, বরং সামাজিক সম্প্রীতিকেও নষ্ট করছে।

মোটকথা, বাংলাদেশে নৈরাজ্যের এক নীরব কিন্তু সুসংগঠিত সংস্করণ বাস্তবায়িত হচ্ছে, যেখানে প্রকাশ্য সংঘর্ষের পরিবর্তে ধীরে ধীরে সরকারি কাঠামো, আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হচ্ছে। এর ফলে সমাজে এক ধরনের মানসিক দাসত্বের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। মানুষ ভয়ে নীরব, আর সেই নীরবতাই হয়ে উঠছে জেহাদিদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র। বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে, তা কোনো সাময়িক সংকট নয়; বরং একটি গভীর প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন। সরকারের তিনটি প্রধান স্তম্ভ— আইন, বিচার ও প্রশাসন যখন নিরপেক্ষতা হারায়, তখন নৈরাজ্য আর ব্যতিক্রম থাকে না, সেটিই হয়ে ওঠে নিয়ম।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলার বিস্তার। দীর্ঘদিন ধরে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং হিউম্যান রাইট্স্ ওয়াচ বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে। অভিযোগ মামলা দায়ের, তদন্ত, চার্জশিট ও বিচার, এর প্রতিটি ধাপেই রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে, যা ন্যায়বিচারের ভিত্তিকেই দুর্বল করছে।

বিশেষ করে মৃত্যুদণ্ডের মতো চূড়ান্ত শাস্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অত্যন্ত কঠোর। যথাযথ প্রমাণ, স্বচ্ছ তদন্ত ও নিরপেক্ষ বিচার ছাড়া মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তা কার্যত 'জুডিশিয়াল কিলিং'-এর নামান্তর। ফলে 'মিথ্যা মামলায় ফাঁসি'র অভিযোগ একটি রাজনৈতিক স্লোগান নয়; এটি একটি গভীর মানবাধিকার সংকটের ইঙ্গিত। অন্যদিকে 'নিষিদ্ধকরণের রাজনীতি' বাংলাদেশে এক বিপজ্জনক প্রবণতা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশ আওয়ামি লিগের মতো একটি ঐতিহাসিক দলকে নিষিদ্ধ করার আলোচনা বহুদলীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। গণতন্ত্রে মতাদর্শের লড়াই হয় জনগণের রায়ের মাধ্যমে; প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে নয়। এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে যে, প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ কার হাতে? আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ক্ষমতায় থাকলেও, নীতিনির্ধারণে 'বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি'র প্রভাবের অভিযোগ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। এই জটিল ক্ষমতার সমীকরণ দেশকে একটি অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে, যেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা অনুপস্থিত। প্রশাসনের দলীয়করণ এই সংকটকে আরও গভীর করছে। নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রাধান্য পেলে প্রশাসন তার পেশাদারিত্ব হারায়। এতে সাধারণ নাগরিক ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং দেশের প্রতি আস্থা ভেঙে পড়ে।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও সংকুচিত হয়ে আসছে। সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও ভিন্নমতের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেপ্তার ও হয়রানির অভিযোগ বারবার সামনে আসছে। গণমাধ্যমের উপর চাপ সৃষ্টি হলে সত্য চাপা পড়ে যায়;আর সত্য চাপা পড়লে দেশ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমিয়ে দেয়, কর্মসংস্থান সংকুচিত হয় এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পায়। একটি দেশ যখন প্রতিহিংসা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন উন্নয়ন কার্যত স্থবির হয়ে যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস প্রমাণ করে— এই জাতি বহুবার সংকট অতিক্রম করেছে। কিন্তু বর্তমান সংকটের বৈশিষ্ট্য হলো, এটি দৃশ্যমান সংঘর্ষের চেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নীরব ভয়ভীতির মধ্যে নিহিত।

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি হলো, বিচারব্যবস্থার পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রশাসনের পেশাদারিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক সংলাপের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা। সর্বোপরি, দেশকে তার নাগরিকদের কাছে জবাবদিহি করার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা হতে হবে। কারণ, ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; কিন্তু একটি দেশের নৈতিক ভিত্তি একবার ভেঙে গেলে, তা পুনর্গঠন করতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যায়।

বাংলাদেশ আজ এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়— এই দেশ কি ন্যায়, গণতন্ত্র ও মানবিকতার পথে ফিরে যাবে, নাকি নৈরাজ্যের এই নীরব কিন্তু ভয়াবহ নতুন সংস্করণই তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে? তবে, এরইমধ্যে সর্বক্ষেত্রে দেশটির যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে তাতে আবারও হয়তো আরেকটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থা তৈরি হতে পারে। □

শেয়ালের বুদ্ধি

এক বনে এক সিংহ বাস করত। তার নাম খরনখর। সারা দিন ঘুরে ঘুরে সে হয়রান হলো। কোনো শিকার পেল না। সন্ধ্যার মুখে প্রচণ্ড খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে সে এক গুহার সামনে পৌঁছল। নিজের আশ্রয়স্থলে ফিরে যাবার মতো ক্ষমতাটুকুও তার ছিল না। ভাবল, আজ রাতটা এই গুহাতেই কাটিয়ে দেবে। এখানে যে বাস করে সে নিশ্চয়ই রাতে ফিরে আসবে। তাকে মেরেই আজকের খিদেটা মিটিয়ে নেব। এই ভেবে সে গুহায় ঢুকে এক কোণে চুপ করে বসে রইল।

ওই গুহায় বাস করত এক শেয়াল। তার নাম দধিপুচ্ছ। সারাদিন সে এখানে-সেখানে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের পর ফিরে এল নিজের ডেরায়।

শেয়াল ছিল খুব চালাক ও সাবধানী। গুহার ভেতর ঢুকতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। মনে কেমন খটকা লাগল। এ যে দেখছি সিংহের পায়ের ছাপ! সেগুলো গুহার ভেতরে পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু সিংহ কি বাইরে বেরিয়ে গেছে? না, তেমন কোনো পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে না।

দধিপুচ্ছ নিঃশব্দে ওখান থেকে খানিকটা সরে দাঁড়াল। সিংহ গুহার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে না বাইরে চলে গেছে নিশ্চিত না হয়ে গুহার ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।

শেয়ালের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে গুহাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করে বলল— ও ভাই গুহা, গুহা-আ-আ। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার হাঁক দিল— গুহা, তুমি আজ কথা বলছ না কেন? চুপ কেন? কী হলো তোমার? তুমি কি আমাদের শর্তের কথা ভুলে গেছ? আমি তোমাকে বাইরে থেকে হাঁক দেবো আর তুমি সেই ডাকে সাড়া দেবে। কিন্তু আজ কোনো সাড়া পাচ্ছি না কেন? যদি সাড়া নাই-ই দাও, তাহলে বলে রাখছি, আর এখানে থাকছি না। অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি।

শেয়ালের কথা গুহার মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সিংহের কানে গেল। সিংহ ভাবল, গুহা হয় তো রোজ এই শেয়ালকে ডেকে নেয়। আজ আমার ভয়ে সাড়া দিচ্ছে না। সাড়া না পেয়ে শেয়াল চলে যেতে চাইছে। তাহলে তো আমার না খেয়ে সারা রাত কাটাতে হবে। আমিই বরং গুহার হয়ে শেয়ালের সঙ্গে আজ কথা বলি।

সিংহ বলল— ও ভাই শেয়াল, এসো, ভেতরে এসো বন্ধু।

মেঘ ডাকার মতো সিংহের গর্জনে গুহার দেওয়াল বুঝি কেঁপে উঠল। দূরের জানোয়ারেরা পর্যন্ত ওই শব্দে চমকে উঠল।

দধিপুচ্ছ বিড়বিড় করে বলল— ওরেব্বাবা! ওই সিংহ আমাকে খাবে বলেই গুহার মধ্যে ঢুকে বসে রয়েছে। একটু অসাবধান হলেই আর রক্ষে ছিল না। আর এখানে নয়, পালাই।

শেয়াল চিৎকার করে বলল— গুহা কথা বলছে এমনটি তো বাপের জন্মে শুনিনি। অবাক কাণ্ড, সিংহমশাই আপনি থাকুন, আমি বিদায় নিলুম।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

বালপাকরাম

বালপাকরাম জাতীয় উদ্যান মেঘালয় রাজ্যের দক্ষিণ গারো পাহাড় জেলায় অবস্থিত। এই উদ্যান ২২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩০০০ ফুট উঁচু। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এই উদ্যান ১৯৮৭ সালে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা পায়। এই উদ্যানে গভীর গিরিখাত রয়েছে। এখানে বিরল লাল পাণ্ডা, ইশিয়ান হাতি, বেঙ্গল টাইগার, মেঘলা চিতাবাঘ, মেছো বেড়াল, বাইসন, বন্য গোরু দেখতে পাওয়া যায়। এই উদ্যান প্রচুর ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছপালা ও লতাপাতায় সমৃদ্ধ। মাংসাশী কলস উদ্ভিদ এই উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ। উদ্যানের হ্রদে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির আবাসস্থল। এই উদ্যান ভ্রমণের সেরা সময় হলো অক্টোবরের শেষ থেকে মে মাস পর্যন্ত। প্রবেশ মূল্য দিয়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১০৯

কুতঃ দ্বারা প্রশ্ন
('কোথায়' দিয়ে প্রশ্ন)

অভ্যাসং কুর্মঃ –

কুতঃ ফলং পততি ?
কোথা থেকে ফল পড়ে ?

কুতঃ গঙ্গা প্রবহতি ?
গঙ্গা কোথা থেকে প্রবাহিত হয় ?

শিক্ষকঃ কুতঃ আগচ্ছতি ?
শিক্ষক কোথা থেকে আসেন ?

ভগিনী কুতঃ পুষ্পম্ আনয়তি ?
ভগিনী কোথা থেকে ফুল আনে ?

ছাত্রা কুতঃ পত্রিকাং নিষ্কাসয়তি ?
ছাত্রী কোথা থেকে পত্রিকা বের করে ?

মাতা কুতঃ পত্রিকাং ধনং দদাতি ?
মা কোথা থেকে টাকাপয়সা দেন ?

কুতঃ দ্বারা প্রশ্ন কুর্বন্তু।
কোথায় দিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করব।

ভালো কথা

ঠাকুরদা-ঠাকুমা পূজন

গত ৪ এপ্রিল আমাদের স্কুলে স্কুলে ঠাকুরদা-ঠাকুমা পূজা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অর্থাৎ স্কুলে গিয়ে সবাই নিজের নিজের ঠাকুরদা ও ঠাকুমাকে পূজা করবে। সেদিন আমিও আমার দাদু (ঠাকুরদা) ও ঠাকুমাকে স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমে প্রার্থনা ও সমবেত গীতাপাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হলো। তারপর সবাই নিজের নিজের ঠাকুরদা ও ঠাকুমার পা জল দিয়ে ধুয়ে গামছা দিয়ে মুছে , কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে ফুল দিয়ে পূজা করলাম। তারপর তাঁদের মিষ্টি খাওয়ালাম। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে বসে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি এলাম। এদিনটি আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদিনটি কোনোদিন ভুলতে পারা যাবে না।

শৌর্য্য দত্ত, চতুর্থশ্রেণী, অভিরামপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) তা পা র বা	(১) ভূ বি দ্ম ষ প ণ
(২) দা পা হা রা	(২) প পু ষ র রু ম

৬ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) অকালমৃত্যু (২) আইনসভা

৬ এপ্রিল সংখ্যার উত্তর
(১) আইবুড়োভাত (২) অহিতসাধন

(১) হ্রতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০। (২) কৃতিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৪) পূজা সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের প্রতি আবেদন

মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট যে অনুপাতে বেড়ে চলেছে তাতে অঙ্কের নিয়মে কিছুদিনের মধ্যেই এই রাজ্যে হিন্দুদের ভোটের আর কোনও মূল্য তথা নির্ণায়ক ক্ষমতাই থাকবে না। মুসলমান ভোটই হবে এই রাজ্যের একমাত্র নির্ণায়ক শক্তি। সেদিন কিন্তু তৃণমূলি হিন্দু, কমিউনিস্ট হিন্দু, লিবারেল কংগ্রেসি হিন্দু অথবা বিজেপির হিন্দু বলে কাউকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হবে না। নির্বিচারে গণহত্যার শিকার হতে আপামর হিন্দুকে।

ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ

বর্তমান প্রবন্ধটির ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকারই আবশ্যকতা নেই। এই প্রবন্ধের শিরোনাম থেকেই পাঠক-পাঠিকারা প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারছেন, এই আশা করাই যায়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের প্রথম দফা সম্পন্ন হয়েছে, দ্বিতীয় দফা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নিঃসন্দেহে আজ পশ্চিমবঙ্গ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। এই সন্ধিক্ষণ হলো পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ আগামীদিনে কোন পথে যাবে তথা পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুরা আদৌ এই রাজ্যে বসবাস করতে পারবেন কিনা তা নির্ণয়ের সন্ধিক্ষণ। স্বাধীনতা লাভের সময় দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি। এই পশ্চিমবঙ্গ হলো ভারত-কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে গড়ে তোলা হিন্দু হোমল্যান্ড। শ্যামাপ্রসাদ বুঝেছিলেন যে, দেশভাগ যখন অনিবার্য, তখন বাঙ্গালি হিন্দুদের জন্য এক নিজস্ব ভূখণ্ড থাকা আবশ্যক; কারণ মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে বসবাস করা তথা মুসলমান অধ্যুষিত বা মুসলমান

সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় বসবাস করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি সর্বান্তঃকরণে প্রয়াসী হয়ে ইংরেজ শাসক, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের হাত থেকে বাঙ্গালি হিন্দুর হোমল্যান্ড স্বরূপ এই পশ্চিমবঙ্গকে সুরক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তারপর বহু দশক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। যে বাঙ্গালি হিন্দুরা একদিন সর্ববিষয়েই ভারতকে পথ দেখাত আজ সেই জাতি একেবারে পিছনের সারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এর জন্য সামগ্রিক ভাবে দায়ী পশ্চিমবঙ্গের ঘৃণ্য রাজনীতি। বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও তৃণমূলের অপশাসনে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশই অধঃপতিত হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান, সাহিত্য- সংস্কৃতি, বিনোদন, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, নারী-নিরাপত্তা, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ আজ একেবারে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ আদৌ আগামীদিনে বাঙ্গালি হিন্দুদের পক্ষে বাসযোগ্য থাকবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্টই সংশয় রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসক দল অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ এবং ঘৃণ্য রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই এর জন্য দায়ী। মুসলমান তোষণ এবং বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশে সহায়তার বিষয়ে তৃণমূল অবশ্য কমিউনিস্টদের যথার্থ উত্তরসূরী একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। তৃণমূলের ভোট-রাজনীতির কারণে এই সকল অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি মুসলমানেরা জাল ভারতীয় নথিপত্র বানিয়ে ভারতীয় সেজে ভারতে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। প্রকৃত ভারতবাসী জীবন ও জীবিকা এর ফলে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই বিষয়ে

ফঃ ৬

সকলেই অবগত যে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশাল আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে। এই বিশাল সীমানার মধ্যে অনেকটা অংশই আবার জলসীমানা তথা নদীপথ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসহযোগিতার কারণেই এই বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকার একটা বিরাট অংশে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ সম্পূর্ণ করা যায়নি। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিয়ত এই যে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের মাধ্যমে ভারতে অবৈধ মুসলমান অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের যোগসূত্রও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। আসলে পশ্চিমবঙ্গ হলো ইসলামিক জঙ্গিদের সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সীমান্তের সুরক্ষার দায়িত্বে থাকা বিএসএফকে এই রাজ্যে নানাভাবে বিব্রত করা হয় এবং তাদের সঠিকভাবে কাজ করতে সর্বতোভাবে বাধা দেওয়া হয়ে থাকে। রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের নির্দেশেই অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া হয়ে থাকে। তৃণমূলি জাদুতে কখন যে ওপারের রাকিবুল এসারের রাকেশ কিংবা ওপারের ফাতিমা এপারের প্রতিমা হয়ে যাবে তা একমাত্র তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরাই বলতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকা-গুলির জনবিন্যাস সম্পূর্ণভাবেই বদলে গিয়েছে। বিভিন্ন জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আজ হিন্দুরা একটু একটু করে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছে। নিঃসন্দেহে এ এক ভয়াবহ অশনি-সংকেত! বৈধ এবং অবৈধ এই উভয় প্রকার মুসলিম জনগোষ্ঠীই হল তৃণমূলের ভোটব্যাংক আর তাই এই ভোটব্যাংককে অটুট রাখতে তৃণমূল কংগ্রেস একেবারেই মরিয়া হয়ে উঠেছে। তৃণমূলের মুসলমান তোষণের কথা জানে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই তোষণ শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই নয়, সমগ্র ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেই অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর 'দুধেল গাই' তত্ত্বের সঙ্গে পাঠক- পাঠিকারা সকলেই পরিচিত আছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মুসলমানেরা হলো দুধেল গাই। যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও খেতে হয়, এই তত্ত্বে বিশ্বাসী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাই মুসলমান তোষণ এক অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। এর ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, তৃণমূল কংগ্রেসের নির্লজ্জ মুসলমান তোষণের ফলে এই রাজ্যে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ আজ একেবারেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সহজেই অনুমেয় যে, মুসলিম তোষণকারী মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বরাদ্দ হলো দুধেলগাইয়ের দুধটুকু এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে দুধেলগাইয়ের লাথিটা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বচন অনুসারে এই রাজ্যের হিন্দুরা মুসলমানদের দয়ার উপরে নির্ভর করে এই রাজ্যে বসবাস করছে, কারণ মুসলমানেরা যদি ইচ্ছা করে তবে এক সেকেন্ডে হিন্দুদের জীবন ও জীবিকা একেবারে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আসলে প্রতিনিয়তই রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর থেকে এই বার্তাই দেওয়া হয়ে চলেছে মুসলমানদের উদ্দেশে। এই কারণেই এই রাজ্যের এক মুসলমান বিধায়ক তাদের জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলবার সাহস পেয়ে থাকে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের উপরে যে কি ভয়াবহ নির্যাতন করা হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুদের উপরে যে ভয়াবহ অত্যাচার চলছে প্রতিনিয়ত, এই বিষয়ে নতুন করে আর বলবার কিছুই নেই। সম্প্রতি মোথাবাড়িতে এস আই আর-এর কাজে নিযুক্ত বিচারকগণ পর্যন্ত জিহাদি মুসলমানদের দ্বারা ভয়ংকর ভাবে আক্রান্ত হয়ে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছেন। কলকাতা শহরেই দুর্গাপূজার সময়ে পূজামণ্ডপে হামলা চালানোর সাহস পেয়েছে শাসকদলের মদত পুষ্ট জেহাদিরা। জোর জবরদস্তি করে রাস্তা আটকে নমাজ পড়বার সাহস পাচ্ছে এই সকল জিহাদির দল আর এটা পশ্চিমবঙ্গ বলেই সম্ভব হচ্ছে, কারণ এখানে মুসলমানদের জামাই আদর করা হয় এবং তাদের জন্য এই রাজ্যে নেই কোনো আইন। বস্তুত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় মুসলমান ব্যতীত কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই থাকা সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাস এই কথাই বলে থাকে এবং যে জাতি পৃথিবীর ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, সেই জাতি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে চিরতরে মুছে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুদের তাই আজ হিন্দুত্বের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। মনে রাখতে হবে যে, ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন কেবলমাত্র একটি বিধানসভা নির্বাচন মাত্র নয়; এবারের নির্বাচন হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এই লড়াই পশ্চিমবঙ্গকে 'সোনার বাঙ্গলা' রূপে গড়ে তোলবার লড়াই এবং তৃণমূলের অপশাসন থেকে সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গকে মুক্ত করে জাতীয়তাবাদী তথা হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলকেই পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় নিয়ে আসতে হবে। তবেই বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গ, তবেই বাঁচবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দু।

উল্লেখ্য যে, কলকাতার মহানাগরিকের ঘোষণায়, যারা ইসলামে জন্মগ্রহণ করে না তাদের নিতান্তই দুর্ভাগা বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং এমন সব দুর্ভাগাকে রীতিমতো দাওয়াত দিয়ে ইসলামে নিয়ে আসার জন্য বৃহত্তর মুসলমান সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এহেন মহানাগরিকের নিজের কথাতেই স্পষ্ট যে, কলকাতার একাধিক

অঞ্চল মিনি পাকিস্তানে পরিণত হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া কলকাতার মহানাগরিক অত্যন্ত পুলকিত এই কথা ভেবে যে, অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক সংখ্যক মানুষ উর্দু ভাষায় কথা বলবেন। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গে আরবি অপসংস্কৃতির আমদানি ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে।

কাজেই বোঝাই যাচ্ছে যে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে যদি তৃণমূল কংগ্রেস পুনরায় জয়যুক্ত হয় তবে নিঃসন্দেহেই অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালি হিন্দুদের আরও একবার নিজেদের সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা কিংবা লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুসলিম ভোট একটা নির্ণায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। বলাই বাহুল্য যে, মুসলমান ভোট অত্যন্ত সঙ্ঘবদ্ধ এবং এই ভোট সম্মিলিতভাবে যে দলের পক্ষে যায় নির্বাচনে তাদেরই জয় হয়ে থাকে। অতীতে এমনটাই লক্ষ্য করা গিয়েছে। এর মূলে রয়েছে বাঙ্গালি হিন্দুদের অনৈক্য এবং রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। যেহেতু বাঙ্গালি হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাই এই রাজ্যে হিন্দুরা বহুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, একজোট হওয়া মুসলমান ভোটের কারণে তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন সময়ে একের পর এক নির্বাচনে জয়লাভ করেছে। মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান ভোট যে অনুপাতে বেড়ে চলেছে তাতে অঙ্কের নিয়মে কিছুদিনের মধ্যেই এই রাজ্যে হিন্দুদের ভোটের আর কোনও মূল্য তথা নির্ণায়ক ক্ষমতাই থাকবে না। মুসলমান ভোটই হবে এই রাজ্যের একমাত্র নির্ণায়ক শক্তি। সেদিন কিন্তু তৃণমূলি হিন্দু, কমিউনিস্ট হিন্দু, লিবারেল কংগ্রেসি হিন্দু অথবা বিজেপির হিন্দু বলে কাউকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হবে না। নির্বিচারে গণহত্যার শিকার হতে হবে হিন্দু তথা কাফেরদের যা অতীতে বারবার ঘটেছে। তাই সময় থাকতে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। যদি বাঙ্গালি হিন্দুরা, নিজেদের এবং নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষিত রাখতে চায়, যদি আরেকটা দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং না চায়, যদি আরেকটা নোয়াখালী না দেখতে চায়, যদি কাশ্মীরি পণ্ডিতদের মতো পরিণতি না ঘটাতে চায়, যদি নিজভূমে পরবাসী না হতে চায় তবে ২০২৬ তাদের কাছে অন্তিম সুযোগ। এই সুযোগ হেলায় হারালে ইতিহাস যে বাঙ্গালি হিন্দুদের কোনদিনও ক্ষমা করবে না, একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়।

তৃণমূল কংগ্রেস একটি আদ্যন্ত দেশবিরোধী রাজনৈতিক দল। এই দলটি আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এবং সর্বপ্রকার দেশবিরোধী কাজে মদত দিয়ে থাকে। দেশের বহু রাজ্যে এসআইআর এর কাজ সুষ্ঠুভাবে হলেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে ও বিরোধিতায় এই রাজ্যে তা বারে বারে বিঘ্নিত হয়েছে। বস্তুতঃ তৃণমূলের উদ্দেশ্য ছিল অবৈধ ভোটারদের ভোটার তালিকায় রেখে দেওয়া এবং এইভাবে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করা, যা তৃণমূল অতীতেও করেছে। কিন্তু ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবারে যথেষ্টই সতর্ক আর তাই তৃণমূলের কোনো ষড়যন্ত্র ও জারিজুরি আর খাটেনি, এমনকী সুপ্রিম কোর্টও এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর আপত্তিকে সরাসরি উড়িয়ে দিয়েছে। তাই তৃণমূলের অবৈধ ভোটব্যাংক এবার ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে আর এই কারণে তৃণমূল যে নিঃসন্দেহে এবার ভয়ে কম্পিত, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। শেষ চেষ্টা হিসেবে তৃণমূল নানারকম অবান্তর তত্ত্ব খাড়া করে মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে চলেছে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তৃণমূলের দোসর বাম, কংগ্রেস ও মাওবাদীরা। যতদিন তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকবে ততদিনই এদের ব্যবসা চলবে পুরোদমে। তাই হিন্দু ভোট ভাগাভাগি করে এরা তৃণমূলকেই সুবিধা করে দিতে চায়। এই বিষয়ে বাঙ্গালি হিন্দুদের অতিশয় সতর্ক থাকতে হবে।

বাঙ্গালি হিন্দুকে আজ উপলব্ধি করতে হবে যে, রাষ্ট্রবাদী দল বিজেপির হাতেই পশ্চিমবঙ্গ ও বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত থাকবে। ধ্বংসাত্মক শক্তিকে পরাস্ত করতে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে চলেছে। এই সকল সংগঠনের পাশে দাঁড়িয়ে এদের আদর্শে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করে আগামী নির্বাচনে হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে জয়যুক্ত করাই হিন্দু সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া দরকার। ভুলভাল মন্ত্র উচ্চারণ করা, হিন্দু দেব-দেবীর নামও সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারা, হিন্দুধর্মকে 'গন্দা ধর্ম' বলে গালিগালাজ, কথায় কথায় নানাবিধ অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করা দেশবিরোধী শক্তিকে পরাজিত করতেই হবে। হিন্দুত্বের ধ্বজ আজ ভারতের সর্বত্র বিজয়গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকেও এই মহান যজ্ঞে সমবেত হতেই হবে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ, ঋষি অরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুর প্রমুখ মহামানব ও মহামনীষীদের পদধূলিধন্য এই পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল কংগ্রেসের অপশাসন থেকে মুক্ত করে হিন্দুত্ববাদী তথা জাতীয়তাবাদী শক্তিকেই এই রাজ্যে জয়যুক্ত করতে হবে। তবেই গড়ে উঠবে সোনার পশ্চিমবঙ্গ। শ্রীভগবান পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের সুবুদ্ধি প্রদান করুন, এটাই প্রার্থনা।

(লেখক অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক)

কিছু মেঘ আছে তবুও মাতৃশক্তির আলোর ঠিকানা মেঘালয়

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

যেখানে জল পড়ে পাতা নড়ে। যেখানে মেঘ করে আবার ঝলমল রোদ্দুর হাসে। পৃথিবীর শুদ্ধ শান্ত স্নিগ্ধ নিঃশ্বাস সমীরের রাজত্ব, বাতাসের গান পাখির কলরব আর বিচিত্র ফার্নের মতো বিচিত্র সংস্কৃতির খেলাঘর উত্তর-পূর্ব ভারত তথা ভারতের সবুজতীর্থ মেঘালয়। আমরা অনেকেই খোঁজ রাখিনি মেঘঘরে সূর্যের সঙ্গে বৃষ্টির লুকোচুরি খুনসুটিতে গারো পাহাড়ের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য রাশির মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু ঢালে কফি চাষ হয়। এ স্বাদ একেবারেই নিজস্ব। সম্ভবত একমাত্র কফি, যাতে কোনো বাড়তি সুগন্ধি দিতেই লাগেনা। যারা ফ্লেভার্ড কফি খোঁজ করেন তাঁরা বিস্মিত হবেন এই চুপিসারের কফিতে। দিব্যি ফলের মিষ্টি গন্ধ এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস সেই কফি দানায়। প্রকৃতির এমন আশ্চর্য লীলাঘর মেঘালয়। হয়তো অসংখ্য প্রাকৃতিক সাংস্কৃতিক সম্পদ এমন সুন্দর ভাবে সংরক্ষিত। কারণ এ রাজ্যের প্রথম ও শেষ সম্পদ, শক্তি নারী। নারী অধিকার, নারী ক্ষমতায়ন, নারীতান্ত্রিক সমাজের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, বিশ্বের দরবারে তাক লাগিয়েছে ওদের সমাজ ব্যবস্থা। নারী বা পুরুষ তান্ত্রিক বলে কোনো ব্যবস্থাকেই চিহ্নিত করা তেমন একটা বুদ্ধিমত্তার কাজ নয়। সমাজ হোক উভয়তান্ত্রিক। তথাপি, মেঘালয় এক বিস্মিত করার মতো সমাজ চেতনা। মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও কোথাও এতটুকু শালীনতার অভাব নেই। পরিমিতিবোধ ঠিকানা হারায় না। এবং পুরুষদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র অসহযোগিতা ব্যবহারিক ঔদ্ধত্য টুকু নেই। Matrilineal-শব্দটাতো প্রায় লেখাই হয় না, বলাও হয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের এক ছোট্ট রাজ্য মেঘালয় সারা বিশ্বের কাছে রোল মডেল হতে পারে। মাতৃশক্তি যদি কর্মঠ হয়, যদি অর্থনৈতিক-সামাজিক- রাজনৈতিক-পারিবারিক মুখ্য দায়িত্ব পালনের সব জোর উদ্যম তাঁরা ধরেন তাহলে তা যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের মতোই নিরাপদ সুন্দর স্বাধীন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলেই হয়তো মেঘালয় নিয়মানুবর্তিতারও ঠিকানা। মেঘালয় সেটাই যেখানে--- 'Freedom meets with discipline'। ভারতীয় সংবিধানের সামাজিক প্রস্তাবনা সর্বাধিক পালন হয় এখানেই।

বিষয়ের ভিতরে যাই। আঞ্চলিক খাসি সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা মেঘালয়ের মূল উপজাতি। এই খাসি উপজাতি নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভাবে মোট সাতটি উপজাতির মিশ্রণ--- খানরিয়াম, নার, ভোই, ওয়ার, মারাম, লিং-গম, ডিকো। মেঘালয়ে যেমন সেভেন সিস্টার ফলস অবিশ্রান্ত ধারায় তার উপস্থিতি সজাগ করে, তেমনই এই 'সেভেন হাটস' নিয়েই খাসি সমাজ তার নারীকেন্দ্রিক সমাজ মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা শির উন্নত রেখেছে। তারা অদ্ভুত রকম পরিশ্রমী কিন্তু আড্ডাবাজও। আত্মমর্যাদায় আঘাত এলেই রাগচটা, আবার সারাক্ষণ এটা-ওটা নিয়ে হাসিখুশি। ঠিক ওই কফি বিনস-এর মতোই খাসি সম্প্রদায়ের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, যে স্বাদের ভাগ ওরা কাউকেই দেবে না। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সমাজবিজ্ঞানী এই বিশেষ সিভিল সোসাইটি প্রত্যক্ষ করতে দৌড়ে আসেন। তারপর তাঁরা অনুভব করেন, ভারতের মাতৃশক্তি ঠিক কেমন। যারা সেকেন্ড ওয়েভ, থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম কপচেই চলে, তাদের আয়না হবে এই খাসি মায়েরা, দিদিরা, বোনেরা। প্রসঙ্গত, শিলঙের সিভিল সোসাইটি 'উইমেন অর্গানাইজেশন' নামক এক সংস্থা কোনোরকম অশিষ্টাচার, মহিলার উপর অন্যায়, এমনকী সরকারের ভুল, দুর্নীতি ছেড়ে দেয় না। ২০০৯-এর ৩১ মার্চ, একটি মহিলার নৃশংস হত্যার পর এই নারী পরিচালিত সংস্থা রীতিমত পুলিশ প্রশাসনের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। সরকার যেন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা তখন। খাসি উইম্যান ওয়েল ফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন নগর গ্রাম পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে উদ্যোগী। এরাই প্রচার চালায় মেঘালয়ের রাজনৈতিক পরিবেশটাও হবে পরিচ্ছন্ন। আর্ডেন্ট বাসাইআউমো যে উদ্যম নিয়েছিলেন তা পরিবার থেকে বিধানসভা সর্বত্র প্রভাব ফেলেছিল। এখনই প্রশ্ন আসবে, মেঘালয়ের থেকে ক'জন

নারী সাংসদ হয়েছেন? যদি বলি তাঁরা চানইনি। লোকাল বডি তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তাঁরা চান বাড়ির ছেলেটা যদি নেশা করে বাঁদরামি করলে যেন তাকে উত্তমমধ্যম দিয়ে সোজা পথে চলার অধিকার তাঁদের থাকে। তাই, খাসি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, গারো অটোনোমাস কাউন্সিল, গ্রামীণ সমবায় ব্যাংকে প্রমীলাবাহিনী। দোকান-বাজার থেকে হেঁশেল সর্বত্র দিদিরাই রয়েছেন। মায়ের সম্পত্তি পাবে কন্যারাই। একটা ছেলে কি তা বলে বঞ্চিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত? নারী অধিকার যেখানে ষোলো আনা খাঁটি--- সামাজিক অপূর্ণতা, বৈষম্যহীনতাটাও সেখানে ঠাঁই পায় না। এই রাজ্য থেকেই মাথা উঁচু করে ভারতীয় বৃহত্তর রাজনীতিতে এসেছেন ড. অ্যাম্পারেন্স লিঙগধ, মাইসালিন ওয়ার, ডেবোরা মারাক, আইরিন লিঙগধ। আরো মজার কথা, অনেক বুথে পুরুষের চাইতে মহিলার সংখ্যা অধিক। মেঘালয়ে সামাজিক চেতনার জন্য সরকারকে চাপ দিয়েছিল কয়েক জন মেয়েই। তাঁরা হলেন অ্যাগনিস খারসিং, অ্যাঞ্জেলা রানগাড, হাসিনা খারবিহ। যাঁরা মানুষের প্রতি অন্যায় হলে বা মানবাধিকার লঙ্ঘন হলেই সরকারের ঘুম কেড়েছেন। একটা রাজ্য ও তার অর্থনীতি থেকে রান্নার মশলা সবটাই রয়েছে মাতৃশক্তির হাতে। এদের দেখে এমনটাই মনে হবে, কেউ যেন অধিক মাতব্বর না হয়, বেয়াদব না হয়, সমাজবিরোধী না হয়। নিয়ন্ত্রক শক্তি যেহেতু নারী, তাই অনিয়ম, লিঙ্গ বৈষম্য ভিত্তিক অন্যায় অবিচার এরা চেনেই না। এই সমাজ যেন সত্যিই ভারত মায়ের পূর্ণ শশী রূপের প্রতিফলক।

ভারতের উত্তর-পূর্বের মেঘালয় হলো--- ঐক্য, সত্য, সাহসের ভূমি। বিদেশিরা বলে এশিয়ার স্কটল্যান্ড। এটাও একরকম দ্বিতীয়শ্রেণীর উপমা। মেঘালয়ের প্রকৃতি ও জীবন সৌন্দর্য আসলে একাকার। এ রাজ্য হলো বিশ্বের সামনে রূপে-গুণে-পরিমিতিবোধে এক চিত্রাঙ্গদা।

সবাই সাধারণ ভাবে এটুকুই জানে যে, উত্তর-পূর্ব ভারত বিশেষ করে মেঘালয় মানে সংখ্যার ভিত্তিতে লিঙ্গ সাম্য। অর্থাৎ জেন্ডার রেশিও, লিটারেসি রেট এখানে উন্নত। পরিসংখ্যান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সেই পরিসংখ্যানের কারণ খোঁজা। খোঁজ করা হয়, কেন ওরা এত উন্নত মনের, স্বাধীন চেতনার, শৃঙ্খলাতে বাঁধা। মেঘালয়ের ৩২.৩২ শতাংশ জমির মালিক নেই, সবাই মালকিন। এক উপজাতি সমাজ যে উন্নত জীবনবোধে জারিত তার থেকে গোটা বিশ্বের শেখা উচিত নারী স্বাধীনতার নামে যে বেলেল্লাপনা আমাদের অতি-নারীবাদী আরবান মাও বা অতি-আঁতেলরা করে। মেঘালয়ের মূল অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অর্থাৎ ভিলেজ এমপ্লয়মেন্ট কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন, সেক্রেটারি একটানা ২০১৯-২৪ পর্যন্ত মহিলারাই ছিলেন। এবারও তাঁরাই রয়েছেন। মেঘালয় ট্যুরিজম, হোম স্টে স্কিম-২০২৪, মহিলাদের হাসি আরও চওড়া করেছে। যদি কেউ তর্ক করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কি মেয়েদের জন্য খরচা কম করে রাজ্য সরকার? তাহলে এত মেঘালয় মেঘালয় করা কেন? রাজ্য সরকার কোন খাতে কত টাকা বরাদ্দ করল, তা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, তার চেয়ে অধিক মূল্যায়ন করতে হবে সমাজতত্ত্ব, মনস্তাত্ত্বিক সমাজ গঠন, পারিবারিক শিক্ষা, লিঙ্গ সাম্য এবং লিঙ্গ ভিত্তিক আচরণের মূল্যবোধ, স্বাধীন থেকেও স্বাধীনতার অপব্যবহার না করার নৈতিক জোর ওই পাহাড়ের খেটে খাওয়া মেয়েদের থেকেই শিক্ষণীয়। যারা সব কিছুর নিয়ন্ত্রক হয়েও ধরাকে সরা জ্ঞান করেনা। পারবে কি আমাদের রিলস্ বানানো নিজেকে সস্তার বিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত করা মেয়েরা! তারজন্য আমাদের ভদ্দরলোকেদের সম্পূর্ণ সমাজ চেতনাটাই দায়ী।

একটাই প্রশ্ন আসবে খাসিদের দেখলে, খ্রিস্টান মিশনারিরা যেভাবে ওদের চক্রব্যূহে বেঁধে ফেলেছে--- তা তাঁদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনা, অভ্যাসের থেকে তাঁদেরই অজান্তে বিচ্যুত করছে নাতো! এটা অস্বীকার করার উপায় নেই খ্রিস্টান মিশনারিরা খাসি মহিলাতন্ত্রে নাক গলায়নি। এখনও খাসি পরিবারের ছোটো মেয়েটির বিবাহ সবার শেষে হয় এবং তাঁর স্বামী ঘরজামাই থাকতে বাধ্য (রীতি তাই। মেয়ের মত ভিন্ন হলে তা আলোচনা সাপেক্ষ) কারণ সব মালকিন শ্বশুরবাড়ি গেলে ঘর সামলাবে কে? ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তর-পূর্ব ভারতে শিক্ষা প্রসারের ছুতোয় এই স্বপ্নরাজ্য মেঘালয়েও এসেছিল। তারপর দেখল এতো সুবর্ণ

সুযোগ সরল খাসি সম্প্রদায়ের মানুষদের ধর্মান্তরিত করার। ওয়েলস্ মিশনারি থমাস জোনস খাসি ভাষা পর্যন্ত শিখলেন। তারপর কেল্লাফতে। রোমান স্ক্রিপ্ট, খাসি ভাষায় লিখে দেদার বিলি হলো বাইবেল। আজকেও হচ্ছে। পাহাড়ের কোলে রডোডেনড্রন, চেরি ফুলের মিষ্টি সুবাস। হর্নবিল ডাকছে। গাছের তলায় হঠাৎ দেখা যাবে একটা চেয়ার। খানিক পর আবিষ্কার হবে ওটা বাইবেল পড়ার ও বসার। যেন ধর্মান্তরিত করতে চাইছে হর্নবিল পাখিদেরও। খাসিরা কি তবে ইংরেজ আসার আগে অক্ষর জ্ঞানহীন ছিল? একেবারেই না। খাসি জনজাতিদের মধ্যে চিন্তাবিদ, লেখক এমন ধারার সব উন্নত মানুষ যারা চিরস্মরণীয়। যেমন বাবু জীবন রায় মাইরম, ইউ সো সো থাম, রাধন সিং বেরি। বাবু জীবন রায় রামচরিতমানস পর্যন্ত অনুবাদ করেন খাসি ভাষায়। ইংরেজদের ডিভাইড এন্ড রুল--- বড্ড ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক অপকৌশল ছিল। তা কেবলমাত্রই হিন্দু, মুসলমানের নয়। খাসি ও বাঙ্গালি, খাসি ও সনাতন হিন্দুধর্ম সবতেই তারা বিভেদের প্রাচীর তোলে। রোমান লিপি চাপিয়ে দিল ইংরেজরা ওদের উপর। ধর্মান্তরিত খাসিদের খ্রিস্টান মিশনারিরা অ-ধর্মান্তরিতদের ঘৃণা করার মগজ ধোলাই দিল। বাবু জীবন রায় প্রতিবাদ করেন, জিজ্ঞেস করেন কী হচ্ছে এসব! থমাস জারম্যান ১৮৮০-তে উদ্ধত ভাবে বলেন আমরাতো শিক্ষার প্রসারে আসিনি।

আজকে শিলং সরকারি বয়েজ স্কুল কিন্তু ইংরেজদের তৈরি নয়। প্রতিষ্ঠাতা বাবু জীবন রায়। কারণ ইংরেজের হাতে যেন সব ছেলের মাথা না মোড়ে তাই ওই স্কুলের জন্ম। এখনও কিন্তু মিশনারি চার্চে খাসিদের শিকারের বিজয় বাজনা বা বিশেষ সুর বাজানো নিষেধ। সেই নিষেধ শুরু করেন হারবার্ট জোন্স যখন মিশনারিরা ধর্মান্তরিত প্রক্রিয়া সূচনা করে। ওসব বাজনা ছোটোলোকদের, নীচু জাতের, তোমরা এখন থেকে ভদ্রলোক ধর্মান্তরিত খাসি, তাই ওটা মিশনারি চার্চের বাইরে রাখো বাপু। রোমান ক্যাথলিক চার্চ সবচাইতে পুরনো এবং সংখ্যায় বেশি হলেও মেঘালয়ে প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ এবং ব্যাপিস্ট চার্চেরও যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। এত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সেবা ভারতী, সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদের অক্লান্ত চেষ্টায় গারো, খাসি, জেইনটাস, কোচ সম্প্রদায়ের ধর্মান্তরিত মানুষদের সনাতনে (Hindu indigenous faith) ফিরিয়ে আনার সুষ্ঠু প্রক্রিয়া জারি আছে। ২০২৪-এ ৬০টি খাসি ধর্মান্তরিত পরিবার হিন্দু জনজাতি ধর্মে ফিরে আসেন। যদিও পরাবর্তন প্রক্রিয়ায় কত জন খ্রিস্টান হিন্দু হলেন তা মূল উদ্দেশ্য নয়। এই প্রক্রিয়ার প্রধান কারণ খাসিদের ছোটো ছোটো নিজস্ব সব রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আদব কায়দা সংরক্ষণ করা। সাহেবদের ধর্মান্তরিত করা ছাড়া আর কী দায় আছে? ভারতীয়দের দায়িত্ব ওই বাজনাটা আবার বাজুক। খাসি মেয়েরা তাঁদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক জেনসেম বা ধারা পরুক। খ্রিস্টান মিশনারিরা ওদের এতোটাই ক্যাজুয়াল করেছে যে, মেয়েরা নামমাত্র ভাবে 'ধারা' পরিধান করে। ওরা দুইতারা, তাঙ্গমুরি, সরাতি, কানাকড়া আর বানাচ্ছে কই? সব যাদুঘরের সৌন্দর্য হতে বসেছে। শিলং হিন্দু ধর্মসভা-র দ্বারা শ্রীশ্রী জগন্নাথ মন্দির ১৩১০ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত। আর ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করতে ইংরেজ লালায়িত হলো ১৯০৮-এর পর থেকে। উপাসনা পদ্ধতিগত প্রতিযোগিতা করার জন্য এতগুলো কথা নয়, চিন্তার বিষয় হলো--- খাসিরা যেন তাঁদের স্বকীয়তার সঙ্গে অজান্তেই বোঝাপড়া করে না ফেলে। পশ্চিমি সভ্যতার ভিতরে রয়েছে কেবলমাত্রই লোভ। ভারতের উত্তর-পূর্বের মেঘালয় হলো--- ঐক্য, সত্য, সাহসের ভূমি। বিদেশিরা বলে এশিয়ার স্কটল্যান্ড। এটাও একরকম দ্বিতীয়শ্রেণীর উপমা। মেঘালয়ের প্রকৃতি ও জীবন সৌন্দর্য আসলে একাকার। এ রাজ্য হলো বিশ্বের সামনে রূপে-গুণে-পরিমিতিবোধে এক চিত্রাঙ্গদা। □

With Best Compliments from-

A

Well Wisher

পশ্চিমবঙ্গে অরাজকতা অবসানের লক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে ভয়ডরহীনভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতেই হবে

ভোটে জেতার জন্য কী কী করতে পারে তৃণমূল কংগ্রেস তা গত ১৫ বছর ধরে দেখেছে সমগ্র বাঙ্গালি সমাজ, বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ২০১১ পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সংঘটিত প্রতিটি লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে জেতার জন্য বিভিন্ন ভয়ঙ্কর পন্থা অবলম্বন করেছে তৃণমূল দল এবং তাদের পরিচালিত রাজ্য সরকার। যে প্রক্রিয়ায় তারা প্রতিটা ভোট লুঠ করেছে এবং প্রতিটা নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে সেগুলি নিম্নরূপ—

(১) দলীয় হার্মাদ বাহিনীকে এক মাস ধরে রাজ্যব্যাপী ভোট লুঠের প্রশিক্ষণ। (২) রাজ্যের পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোট করানোর জন্য অমরেন্দ্র কুমার সিংহ ও রাজীব সিনহার মতো মেরুদণ্ডহীন ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত আধিকারিকদের রাজ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে বেছে নেওয়া। (৩) ভোটার তালিকায় জাল ও ভুয়ো ভোটার যোগ করা। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গা মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। (৪) পেটোয়া রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের মাধ্যমে ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত। (৫) বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা। (৬) মনোনয়ন তুলে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া। (৭) কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বার বার আদালতে যাওয়া। (৮) বিরোধী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা। (৯) বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট, বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থক-সহ ভোটারদের বাড়ির সামনে সাদা থান ফেলে আসা। (১০) নানারকম ভীতি প্রদর্শনের পরেও বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকরা ভয় না পেলে সরাসরি অত্যাচার শুরু। (১১) ভোটারদের ভোটের দিন বাড়ি থেকে না বেরোনোর নির্দেশ। (১২) ভোটের কাজে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কাজে না লাগিয়ে বা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে কার্যত বসিয়ে রেখে দলদাস পুলিশ-প্রশাসন ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের কাজে লাগানো। (১৩) ভোটের দিন সকাল থেকে বোমা ছুঁড়ে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করা। (১৪) বুথ জ্যাম করা। (১৫) বুথ দখল করে রিগিং ও ছাপ্পা ভোট। (১৬) বিরোধী দলের পোলিং এজেন্টকে অপহরণ। (১৭) রাজ্যের পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটে নকল ব্যালট ছাপিয়ে এনে ব্যালট বাক্স ভেঙে পাল্টে দেওয়া। (১৮) ভোট কর্মীদের ভয় দেখিয়ে নকল ব্যালটে সই করানো। (১৯) ভোট গণনার সময় বিরোধী এজেন্টদের মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া। (২০) অল্প ভোটে হেরে গেলে ব্যালট খেয়ে নেওয়া। (২১) বেশি ভোটে হারলে বিরোধী দলের জয়ী প্রার্থীকে অপহরণ করে 'তিনি হেরেছেন' বলে সই করিয়ে নেওয়া। (২২) সেটাও না পারলে, জয়ী প্রার্থীর ছেলেমেয়েদের কিডন্যাপ করে ব্ল্যাকমেল করিয়ে দল বদল করিয়ে নেওয়া। (২৩) রাজ্যের প্রতিটি নির্বাচন এবং নির্বাচন-পরবর্তী সন্ত্রাসে গোটা ১০০ বলিদান। (২৪) সবশেষে রাজ্যের শাসক দলের পক্ষ থেকে বাঙ্গালিকে রাজনৈতিক সচেতনতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং পিসিমণিকে কন্যাশ্রী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ট্যুইট করা। (২৫) ভোট শেষ হলে প্রায় এক মাস ধরে বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের ঘর ভাঙা, তাঁদের বাড়ি ও দোকানঘরে অগ্নিসংযোগ, তাঁদের ওপর আক্রমণ, তাঁদের বাড়িছাড়া করা, তাঁদের মিথ্যা মামলা দেওয়া, তাঁদের মা-বোনেদের নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানি এবং সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখিয়ে সত্যকে চেপে রাখা। (২৬) ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার সময় আইপ্যাকের মাধ্যমে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করে শাসক দল। কোভিড লকডাউন পরবর্তী পর্যায়ে ভোট গণনায় আইপ্যাকের কর্মীরা মুখে মাস্ক বেঁধে, গলায় রাজ্য সরকারি আধিকারিকের পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে ভোট গণনা পরিচালনা করে বলে বিভিন্ন মহলে অভিযোগ ওঠে। বুথে ভোটদানের সময় ব্যবহৃত ইভিএম যন্ত্রের ভোট গণনার পরিবর্তে 'স্ট্যান্ড বাই' থাকা ইভিএম-গুলির ভোট গণনা করা হয় এবং বিরোধী দলের কাউন্টিং এজেন্টদের কাউন্টিং হল ছাড়তে বাধ্য করে অনেক আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ী বলে সেইবার ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু এবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কড়া এসওপি (স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর)-র কারণে বিধানসভা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার সবরকম রাস্তা বোধহয় বন্ধ। গত ১৫ মার্চ নির্বাচন কমিশনের ভোট ঘোষণার পর বদলির কারণে এবার নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে মুখ্যমন্ত্রী তথা শাসক দলের পেটোয়া আমলা নেই, এসআইআর-এর কারণে মৃত ভোটার নেই। বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী শাসক দলের কথা শুনছে না। তাই শাসক দলের পক্ষ থেকে শুরু হয়েছে ভোটারদের ধমক দেওয়া। বিভিন্ন এলাকায় শাসক দলের গুন্ডাবাহিনী শাসাচ্ছে যে, বুথে থাকা সিসিটিভি-র মাধ্যমে কে কাকে ভোট দিল সেটা নাকি তারা জেনে যাবে। যদিও শাসক দলও আরেক সমস্যায় পড়েছে। যাদের ওপর শাসক দলের ভরসা রয়েছে, তারা বুথের ভিতরে গিয়ে অন্য দিকে ভোট টা দিয়ে দেবে না তো? কারণ ২০২১ থেকে '২৬— রাজ্য জুড়ে অনেক সমীকরণ বদলে গিয়েছে। প্রায় এক কোটি ভোটার কমেছে তালিকা থেকে। এ রাজ্যের বহু মন্ত্রী জেলে গিয়েছে এবং সাধারণ মানুষ দেখেছে যে, তাঁদের করের টাকায় সেই দাগি মন্ত্রীদের বাঁচাতে বার বার আদালতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। দাগি শিক্ষকদের জন্য চাকরির ব্যবস্থা হলেও শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েদের জন্য কোনো কর্মসংস্থান নেই। শাসক দলকে টাকা দিলে তবেই তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরবে। ওবিসি কোটায় সুযোগ পেয়েছে শুধু মুসলমানরা। নির্লজ্জভাবে চলেছে ডাঃ অভয়ার হত্যাকারীদের বাঁচানোর চেষ্টা। রাজ্যের এই গণতন্ত্র নিধনকারী সরকারের কাছে সব আশা হারিয়েছে রাজ্যবাসী। আর সেটা বুঝেছে শাসক দল। তাই তাদের সামনে খোলা রয়েছে একটা মাত্র রাস্তা— সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়া। সঙ্গে জুটেছে একদল বিজ্ঞাপন-প্রত্যাশী, অনুপ্রাণিত সংবাদমাধ্যম। তাদের কাছে নাসিকের কর্পোরেট জেহাদ কোনো খবর নয়, অথচ এ রাজ্যের একজন দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীর খবর তারা সারাদিন ধরে দেখাচ্ছে। মানুষ এবার ধরে ফেলেছে তাদের খেলা। ত্রিপুরা, গুয়াহাটি বা পুরীতে মাছ খাওয়ার চল অব্যাহত থাকলে পশ্চিমবঙ্গে কেন মাছ খাওয়া বন্ধ হবে— এটা বলার বা শাসক দলকে এই প্রশ্ন করার সৎ সাহস নেই তাদের। তবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে মানুষকেই দিনের শেষে। এইবারের ভোট সঠিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে পুরো প্রয়াস চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। সাধারণ মানুষকে সব ভয়ডর ভেঙে বেরিয়ে এসে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে হবে।

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৭১)

গান্ধীজীর সঙ্ঘ দর্শন

সেদিন সকালে ডাক্তারজী ওয়ার্ধা এসে পৌঁছালে স্টেশন থেকে স্বয়ংসেবকরা ঘোষবাদ্য পথসঞ্চলন মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁকে শিবির স্থানে নিয়ে আসে। কিছু সময় পরেই সেবা-গ্রাম আশ্রম থেকে স্বামী আনন্দজী এসে মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানালেন, সময় রাত সাড়ে আটটা। সেদিন ছিল শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। পুণার আন্নাসাহেব ভোপটকরজী ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে আপ্পাজী ও ভোপটকরজী-সহ ডাক্তারজী শ্রদ্ধেয় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আশ্রম পৌঁছলেন। মহাদেব ভাই তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে দোতলায় বৈঠকখানায় নিয়ে যান আর স্বয়ং গান্ধীজী দরজার কাছে এসে সকলকে ভেতরে নিয়ে গেলেন এবং নিজে পাশেই গদিতে বসালেন। প্রায় ঘণ্টা সময় ধরে ডাক্তারজী ও গান্ধীজীর মধ্যে আলোচনা চলেছিল। মাঝে মাঝে তার মধ্যে আন্নাসাহেব ভোপটকরজীও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সঙ্ঘের ইতিহাসে অবশ্যই এই সময়টুকু ছিল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। সে আলোচনার খুব সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল এরকম—

গান্ধীজী : (ডাক্তারজীকে) আপনি নিশ্চয়ই জেনেছেন গতকাল আমি শিবির দর্শনে গিয়েছিলাম।

ডাক্তারজী : আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি শিবিরে গিয়েছিলেন এটা স্বয়ংসেবকদের সৌভাগ্য আমি সে সময় উপস্থিত থাকতে না পারায় খুবই দুঃখিত। আপনি বোধহয় হঠাৎই শিবির দর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি আগে জানতে পারলে অবশ্যই সে সময় উপস্থিত থাকার চেষ্টা করতাম।

গান্ধীজী : আপনি না থাকায় একদিকে ভালোই হয়েছে। আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বিষয়ে নানা তথ্য সঠিক ভাবে জানতে পেরেছি। আপনার শিবিরে সংখ্যা, শৃঙ্খলা, স্বয়ংসেবকদের মনোভাব, স্বচ্ছতা এমন অনেক কিছু দেখে আমি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করেছি। আপনাদের ব্যান্ড আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হয়েছে।

একথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী প্রশ্ন করেন— 'সঙ্ঘে দু-তিন আনায় কীভাবে ভোজন ব্যবস্থা করা হয়! আমাদের কেন বেশি লাগে? আন্নাসাহেবের সঙ্গে মহাত্মাজীর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। এবার উত্তর তিনিই দিলেন— 'আপনাদের বেশি খরচ হয় তার কারণ হলো আপনাদের ব্যবহার। নাম রাখেন 'পর্ণকুটীর' কিন্তু ভিতরে থাকে রাজসিক ব্যাপার। আমি এই মাত্র সকলের সঙ্গে জল-রুটি খেয়ে এলাম। আপনাদের মতো এখানে কোনো ভেদাভেদ নেই। সঙ্ঘের মতো চললে আপনাদেরও দু-তিন আনা খরচই পড়বে, এতে ডাঃ হেডগেওয়ার কী করবেন? আপনাদের তো ঠাটও বজায় রাখা চাই, আবার খরচও কম চাই। এ দুটো একসঙ্গে কী করে চলবে!' আন্নাসাহেবের কথা শুনে সবাই হাসিতে ডুবে গেল। গান্ধীজী সঙ্ঘের বিধান— প্রচার ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলেন। এমন সময় মীরাবেন ন'টা বেজে গেছে বলায় ডাক্তারজী উঠতে অনুমতি চাইলে গান্ধীজী বললেন— 'বসুন বসুন আর একটু কথা বলি, আমি আজ আধা ঘণ্টা পরে শোব'।

গান্ধীজী : আমি শুনলাম আপনি কংগ্রেসে কাজ করতেন, তাহলে এত জনপ্রিয় সংস্থা ছেড়ে আলাদা স্বয়ংসেবক সংগঠন করলেন কেন?

ডাক্তারজী : আমি প্রথমে কংগ্রেসে এই কাজ আরম্ভ করেছিলাম। ১৯২০ নাগপুর কংগ্রেসে স্বয়ংসেবক বিভাগের কার্যবাহ ছিলাম। আমি এবং আমার বন্ধু ডাঃ পরাঞ্জপে কংগ্রেসের মধ্যে এরকম চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। সে কারণেই এই স্বতন্ত্র প্রয়াস।

গান্ধীজী : আপনারা কি পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য পাননি?

ডাক্তারজী : প্রশ্ন অর্থের ছিল না, প্রশ্ন ছিল অন্তকরণের।

গান্ধীজী : আপনি কি বলতে চান কংগ্রেসে ভালো অন্তঃকরণের লোক নেই।

ডাক্তারজী : আমি সে কথা বলতে চাইনি। কংগ্রেসে স্বয়ংসেবকের অর্থ হলো সভা সমিতিতে বিনা পয়সায় টেবিল চেয়ার তোলার লোক। সঙ্ঘে সকলে সমান, সকলে কার্যকর্তা, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য আত্মবোধের সর্বস্ব অর্পণ করার কাজে উদ্বুদ্ধ নেতাকে আমরা স্বয়ংসেবক মনে করি।

গান্ধীজী : সঙ্ঘের আর্থিক প্রয়োজন মেটানোর পদ্ধতি জানতে চাইলে ডাক্তারজী গুরুদক্ষিণা সমর্পণের বিষয়টি বর্ণনা করেন। মহাত্মাজী একে অভিনব ব্যবস্থা বলে আখ্যা দেন। গান্ধীজী কৌতূহলী হয়ে জানতে চান এ কাজে পুরো সময় আপনাকে ব্যয় করতে হয় তবে ডাক্তারী ব্যবসা কখন করেন?

ডাক্তারজী সহজ ভাবে জানালেন তিনি ব্যবসা করেন না।

—তবে পরিবার চলে কীভাবে!

—আমি বিয়ে করিনি।

স্তম্ভিত গান্ধীজী। অনেকটা সময় হয়েছে, মহাত্মাজীর আশীর্বাদ নিয়ে ডাক্তারজী এবার উঠলেন। মহাত্মাজী দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ডাক্তারজীকে আর বিদায় জানিয়ে বললেন— 'ডাক্তারজী, আপনার চরিত্র এবং কাজের প্রতি অটল নিষ্ঠার শক্তিতে আপনার অঙ্গীকারকৃত কার্যে আপনি অবশ্যই সফল হবেন'।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস